contents

নবী-রাসুল সিরিজ-৬

কাসাসুল কুরআন-৬

হযরত সুলাইমান আ.

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

contents

নবী-রাসুল সিরিজ-৬

কাসাসুল কুরআন-৬

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল ইসলাম

contents

কাসাসুল কুরআন-৬
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারূক

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [6]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdullah Al Faruque
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 140.00
ISBN : 978-984-90977-6-1
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম
হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম
হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম

contents

সূ চি প ত্র

contents

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম

contents

হযরত সুলাইমান
আলাইহিস সালাম

বংশ পরিচিতি

হযরত সুলাইমান আ. হযরত দাউদ আ.-এর পুত্র। এজন্য তাঁর বংশপরম্পরা ইয়াহুদার সূত্রে হযরত ইয়াকুব আ. [ইসরাইল] পর্যন্ত পৌঁছে।

তাঁর মাতার নাম জানা যায় নি। তাওরাতে এসেছে, (بنت سبع) বিনতে সাবা। তাও এভাবে যে, প্রথমে তিনি ছিলেন আওরিয়্যাহ-এর স্ত্রী। পরবর্তীতে তিনি দাউদ আ.-এর স্ত্রী হন এবং তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত সুলাইমান আ.। কিন্তু ইতোপূর্বে আমরা এই কাহিনির অসারতা স্পষ্ট করেছি । সুতরাং, হযরত সুলাইমান আ.-এর মায়ের নাম ঐতিহাসিক দিক থেকেও শুদ্ধ নয়।

ইবনে মাজাহ শরিফের একটি হাদিসে শুধু এতটুকু বর্ণিত আছে যে, সুলাইমান আ.-এর জননী একবার তাঁকে এ নসিহত করেন যে, বৎস, রাতভর ঘুমাবে না। কারণ রাতের অধিকাংশ অংশ ঘুমিয়ে কাটালে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন নেক কাজের ভিখারি বানিয়ে দেবে।

পবিত্র কুরআনও শুধু এতটুকু জানিয়েছে যে, তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধর। ইরশাদ হয়েছে—

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ

'আর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুবকে, তাদের দু-জনকে আমি হেদায়েত দান করেছি এবং ইতোপূর্বে হেদায়েত দান করেছি নুহকে, এবং তার বংশধরদের মধ্য হতে দাউদ, সুলাইমানকে।' [সুরা আনআম]

পবিত্র কুরআনে হযরত সুলাইমান আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে হযরত সুলাইমান আ.-এর আলোচনা ১৬ টি স্থানে এসেছে। কয়েকটি স্থানে বিশদ বিবরণসহ আলোচনা করা হয়েছে আর অধিকাংশ স্থানে সংক্ষেপে তার ওপর ও তার পিতা দাউদের ওপর আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও পুরস্কারের কথা আলোচিত হয়েছে। নিম্নের ছকটি পাঠের জন্য সুবিধাজনক :

	আয়াত	সংখ্যা
	১০২	১
	১৬৩	১
আনআম	৮৫	১
আম্বিয়া	৭৮, ৭৯, ৮১	৩
নামল	১৫,১৬,১৭,১৮,২০,৩৬,৪৪	৭
সাবা	১২	১
সাদ	৩, ৩৪	২
		১৬

শৈশব

আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-এর মধ্যে জন্মগতভাবেই প্রখর মেধা ও মামলার নিরসনে সঠিক রায় প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন, শৈশবের সেই ঘটনাটি ছিলো তাঁর আলোকিত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আগমনী বার্তা, যা পবিত্র কুরআনে হযরত দাউদ আ.-এর জীবনীর সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।[১] হযরত দাউদ আ. প্রথম থেকেই তাঁর পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন, ফলে তিনি শৈশব থেকেই তাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রাখতেন। বিশেষকরে বিভিন্ন মামলা-মুকাদ্দমার ফয়সালার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে অবশ্যই পরামর্শ নিতেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম-এর স্থলাভিষিক্তি

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত সুলাইমান আ. প্রাপ্তবয়স্ক হতেই হযরত দাউদ আ.-এর ইন্তিকাল হয়। তখন আল্লাহ তাআলা নবুয়ত ও রাজত্ব উভয়টিতে তাঁকে হযরত দাউদ আ.-এর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন। এভাবে নবুওতের সঙ্গে সঙ্গে বনি ইসরাইলের শাসনক্ষমতাও তাঁর হাতে আসে। কুরআনুল কারিম এই স্থলাভিষিক্ততাকে ওয়ারাসাত বা 'উত্তরাধিকার' শব্দে ব্যক্ত করেছে—

---

১. এখানে وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলাইমানকে; যখন তারা একটি শস্যক্ষেত্র নিয়ে বিচার করছিলেন, যাতে ঢুকে পড়েছে কিছু লোকের মেষপাল)-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

'আর সুলাইমান উত্তরাধিকারী হলো দাউদের।' [সূরা নামল]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, এখানে উত্তরাধিকার বলতে উদ্দেশ্য হলো, নবুয়ত ও শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকার। সম্পদের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নয়। নয়তো হযরত দাউদ আ.-এর আরো অনেক সন্তান ছিলেন, তাঁরা কেনো বঞ্চিত থাকবেন? তা ছাড়া সিহাহ সিত্তায় উচ্চ শ্রেণির সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই হাদিস বর্ণিত রয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. — الحديث

'আমাদের নবীদের সমাজে সম্পদের উত্তরাধিকার চলে না। আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হয়ে যায়।'

উল্লিখিত হাদিস স্পষ্টতই ঘোষণা করছে যে, নবীদের ইন্তিকালের পর কেউ তাঁদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয় না। বরং সেগুলো গরিব-মিসকিনদের অধিকারে চলে যায়। আল্লাহর নামে সদকা হয়ে যায়।

প্রকৃতবিচারে নবীগণের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে এটি খাপ খায় না যে, সম্পদের মতো তুচ্ছ বস্তু তাদের উত্তরাধিকারের মর্যাদা পাবে। কেননা, যে সকল মহান ব্যক্তিত্বের জীবনের একমাত্র মিশন ছিলো, তাবলিগ, দীন প্রচার ও আল্লাহর দিকে আহ্বান; তাদের জন্য কীভাবে সঙ্গত হয় যে, নবুওতের ফয়েজের বাইরে একটি তুচ্ছ বস্তুকে তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে অভিহিত করা হবে? মানুষ হিসেবে জীবন ধারণের জন্য তারা সম্পদ আকারে যা রেখে যাবেন, তাঁদের ইন্তিকালের পর সেটি আল্লাহর মালিকানায় চলে যাওয়াই সঙ্গত। তা গরিব-মিসকিনদেরই অংশ হতে পারবে, সেই উচ্চশ্রেণির মহামানবদের বংশধরদের তা প্রাপ্য নয়।

নবুয়ত লাভ

নবী-রাসুলগণের মধ্য হতে যাদের জীবনী বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায়, তাদের জীবনাচার অধ্যয়নের মাধ্যমে, উপরন্তু পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে, মহান আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তিকে নবুয়ত প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই এই মহান মর্যাদা প্রদান করেন। যাতে দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেও তিনি জীবনের সেই অংশটুকু অতিক্রম করে আসেন, যে সময়ের ভেতর

মানবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পরিপক্কতা লাভ করে। বয়সের এই সীমারেখায় উপনীত হওয়ার পর যোগ্যতা অনুসারে মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তিতে ভারসাম্য ও দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলার এই শাশ্বত বিধান হযরত সুলাইমান আ.-এর ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়েছে। তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হন, তখন তাঁকে শাসনক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নবুয়ত'ও প্রদান করা হয়। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ

'হে মুহাম্মদ, নিঃসন্দেহে আমি আপনার প্রতি ওহি প্রেরণ করেছি যেভাবে ইতোপূর্বে প্রেরণ করেছি নুহসহ তার পরবর্তী অন্যান্য নবীর প্রতি। আরো ওহি পাঠিয়েছি ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরদের প্রতি; এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি।' [সুরা নিসা]

وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

'আর (দাউদ ও সুলাইমান) উভয়কেই আমি হুকুমত দিয়েছি ও (নবুওতের) ইলম দিয়েছি।' [সুরা আম্বিয়া]

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

'আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে (নবুওতের) ইলম দান করেছি।' [সুরা সাদ]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

হযরত দাউদ আ.-এর মতো হযরত সুলাইমান আ.-কেও মহান আল্লাহ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও নেয়ামত দান করেছিলেন, যা তাঁদের জীবনের স্বতন্ত্র প্রতীক হয়ে অন্যদের থেকে তাঁদেরকে বিশিষ্ট করেছিলো।

১. পাখির সঙ্গে বাক্যালাপ

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-এর মতো হযরত সুলাইমান আ.-কেও এ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, তিনি জীব-জন্তু ও পশু-পাখিদের ভাষা বুঝতেন। তাঁদের উভয়ের কাছে পাখিদের বুলি বাকশীল মানুষের কথাবার্তার মতো ছিলো। পবিত্র কুরআনে হযরত সুলাইমান আ.-এর সেই মর্যাদা এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ () وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ()

'আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলো, 'আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পাখিকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' [সুরা নামল : আয়াত ১৫-১৬]

এখানে 'উড়ন্ত পক্ষিকুলের ভাষা' যে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ কথার উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি তার কল্পনা ও অনুমান শক্তির মাধ্যমে পাখিদের ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজ দ্বারা শুধু সেগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন। এর বেশি কিছু নয়।' কেননা, কল্পনা ও অনুমান শক্তি প্রয়োগের এই যোগ্যতা অনেক লোকেরই আছে। তাঁরা পালিত জীব-জন্তুর ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময়ের আওয়াজ, খুশি ও আনন্দের আওয়াজ, প্রভুকে কাছে দেখে খুশি প্রকাশ ও আনুগত্যের আওয়াজ, শত্রুকে দেখে বিশেষ শব্দে ডাকার আওয়াজের মধ্যে ভালোভাবেই পার্থক্য করতে পারতেন। সেগুলো কী চায় তা বুঝতে পারতেন। উল্লিখিত আয়াতে কল্পনা ও অনুমান শক্তির মাধ্যমে পাখিদের উদ্দেশ্য বুঝা উদ্দেশ্য নয়।

তা ছাড়া পাখির বুলি দ্বারা ওই জ্ঞানও উদ্দেশ্য নয় যা জ্ঞানের আধুনিক যুগে ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কতিপয় জন্তুর কথা বলার ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে জুওলজি (ZOOLOGY) বা প্রাণিবিজ্ঞানের একটি শাখা গণ্য করা হয়। কেননা, এগুলোও অনুমাননির্ভর। উপরিউক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পর জ্ঞানের ধনুক থেকে তা বের হয়েছে। এগুলোকে সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান বলে খোদ প্রাণিবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এটি একটি অভিজ্ঞতালব্ধ শাস্ত্র, যা যে কোনো ব্যক্তি চেষ্টা করলে অর্জন করতে পারে। আর বাস্তবতা হলো, হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের যদি এমন জ্ঞানই থাকতো, তাহলে পবিত্র কুরআন এতটা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করতো না।

কুরআনুল কারিম যেভাবে তা উল্লেখ করেছে এবং এর ওপর হযরত সুলাইমান আ.-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার দ্বারা

তীয়মান হয় যে, হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের জন্য এটি ছিলো একটি মহান নেয়ামত। যাকে মুজেযা (নিদর্শান) বলতে হয়। তারা মানুষের মুখের ভাষা যেভাবে বুঝতেন, ঠিক তার মতো করে পক্ষিকুলের ভাষাও বুঝতেন। নিঃসন্দেহে তাদের সেই জ্ঞান ছিলো পার্থিব উপকরণের ঊর্ধ্বে কুদরতের বিশেষ দানের বহিঃপ্রকাশ।

মানববুদ্ধির আলোকে শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, এটি অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, ভাষা ও মানববুদ্ধি উভয়টির বিবেচনায় কথা বলার জন্য শব্দ হওয়াই যথেষ্ট। তার জন্য মানুষের মতো বাচনিক ক্ষমতার প্রয়োজন নেই। জীব-জন্তু ও পশু-পাখিদের ডাকের মধ্যে শব্দ ও শব্দের তরঙ্গ বিদ্যমান। কাজেই পাখির ভাষা বুঝাটা আল্লাহর বিশেষ দান এবং একটি নিদর্শন। যা বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ পেতে পারে না। হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম যেভাবে নিশ্চিতভাবে পাখির ভাষা বুঝতেন, তা বর্তমান পৃথিবীর অধুনা আবিষ্কৃত শাস্ত্রের মতো ছিলো না। এর ওপর সকল মুফাসসিরিন একমত। তবে তার বিশদ বিবরণ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বায়যাবি রহ.-এর মতে, তাঁরা প্রাণীদের ডাক বিভিন্ন অবস্থার আকারে অনুমান শক্তির সাহায্যে বুঝতেন। তবে তাঁরা সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন, নিজের যোগ্যতাবলে নয়; বরং আল্লাহর বিশেষ দানের মাধ্যমে। এটাই হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিমত হলো, আল্লাহর এ দু-জন মহান নবী যেভাবে মানুষের ভাষা বুঝতেন, ঠিক তেমনি প্রাণীদের ভাষাও অবলীলায় বুঝতেন। কেননা, এটি ছিলো একটি মুজেযা, যা তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণত পাখিদের কলকাকলি তাদের শব্দের তারতম্যের বিভিন্নতার আলোকে বুঝা হয়ে থাকে।[১] এখন হতে পারে, বাস্তবেই তাদের আওয়াজগুলো ভাষার একটি স্তর, যার দ্বারা তারা পরস্পরের ভাব-বিনিময় করে। তবে তা অবশ্যই মানবভাষা থেকে অনেক নিম্নস্তরের। হযরত সুলাইমান আ. ও হুদহুদের পারস্পরিক কথপোকথনকে পবিত্র কুরআন যেভাবে উপস্থাপন করেছে, তা আমাদের উল্লিখিত অভিমতকে সমর্থন করে।

---

[১] প্রাণীবিদগণ বলেন, টেলিগ্রাফের শব্দতরঙ্গের মতো প্রাণীদের পারস্পরিক আলাপচারিতা ভাব-বিনিময়ের সময়েও তাদের আওয়াজের মাঝেও এক ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রাণীদের আওয়াজের সেই শব্দতরঙ্গ থেকেই টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হয়েছে।

২. বায়ু বশীকরণ

হযরত সুলাইমান আ.-এর নবুওতের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, মহান আল্লাহ তার জন্য বাতাসকে এমনভাবে বশীভূত করে দিয়েছিলেন যে, তিনি যখন চাইতেন, এক সকালেই এক মাসের পথ পেরিয়ে যেতে পারতেন এবং এক সন্ধ্যায় আরো এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন।

হযরত সুলাইমান আ.-এর উল্লিখিত মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন তিনটি কথা বলেছে। একটি হলো, বাতাসকে হযরত সুলাইমানের জন্য বশীভূত করে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো, বাতাসকে তার হুকুমের এমন অনুগত করে দেয়া হয়েছে যে, প্রবল ও ঝঞ্ঝাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার নির্দেশে সেটি মৃদু ও মন্থর হয়ে আরামদায়ক হয়ে যেতো। তৃতীয় কথা হলো, সেটি এমন আরামদায়ক হওয়া সত্ত্বেও এতটাই দ্রুতগামী ছিলো যে, একজন অশ্বারোহী অনবরত একমাস ঘোড়া ছুটিয়ে যেখানে পৌঁছতো, হযরত সুলাইমান আ. মাত্র এক সকাল সফর করেই সেখানে পৌঁছে যেতেন। যেনো হযরত সুলাইমান আ.-এর সিংহাসন ইঞ্জিন ও মেশিনের মতো বাহিক্য উপকরণের ঊর্ধ্বে ছিলো এবং মহান আল্লাহর নির্দেশে তা একটি দ্রুতগামী উড়োজাহাজের চেয়েও কয়েকগুণ দ্রুততার সঙ্গে বাতাসের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারতো।

একজন প্রকৃতিপূজারী মানুষের দৃষ্টিতে এটি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমরা এটি বুঝতে অক্ষম। কারণ হলো, মানবচিন্তার কাছে এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, মানুষের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি সমান নয়। তদ্রূপ সবার চিন্তাশক্তিও এক নয়। একজন মানুষ যে জিনিসটিকে তার বুদ্ধি দিয়ে করে এবং সেটা করাকে সহজও মনে করে, অন্য ব্যক্তির বুদ্ধি সেটাকে অসম্ভব মনে করে থাকে। এই নীতির আলোকে তাহলে আমাদের স্বীকার করতে অসুবিধা কোথায় যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে সাধারণ কুদরতি নীতি অনুযায়ী বিশ্বচরাচরের বস্তুরাশিকে উপকরণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, তদ্রূপ কুদরতি নীতির কিছু কিছু বিষয়কে উপকরণের ঊর্ধ্বেও রেখেছেন। পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞানীরা কারণের সঙ্গে কারণ জুড়ে ফলাফল বের করে থাকেন। এর বাইরে যেতে পারেন না। কিন্তু মহান নবীগণ এমন ছিলেন না। তারা এর বাইরে থেকেও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন। বর্তমান পৃথিবীর জ্ঞান সেই জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছুবে না। কাজেই এ জাতীয় বিষয়গুলোর সংবাদ যেহেতু ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত, কাজেই মানবধারণা, মানববুদ্ধি ও আকলের সীমাবদ্ধতা দিয়ে সেগুলোর অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করা ঠিক হবে না। যদি কোনো

বস্তুর জ্ঞান আমাদের কাছে না থাকে, তাহলে কি এ দাবি করা ঠিক হবে যে, বস্তুটি আসলে নেই?

কাজেই সবচেয়ে নিরাপদ পথ হলো, বাতাসকে বশীভূত করার ঘটনা ও দ্রুতগামিতাকে কোনো ধরনের ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর তখতের আকৃতি ও তাঁর সকাল-সন্ধ্যার সফর সম্পর্কে যেসব কাহিনি সিরাত ও তাফসিরের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়, তার সবটাই ইসরাইলি রেওয়ায়েত। তার আলোচনা নিরর্থক। তাজ্জবের বিষয় হলো, ইবনে কাসির রহ.-এর মতো একজন গবেষকও এ প্রসঙ্গে সেই রেওয়ায়েতগুলো এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তার মতে এগুলোও স্বীকৃত সত্য। অথচ আদতে তা নয়। কেননা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর ওপর অনেক উত্তরহীন সংশয় আরোপিত হয়। পবিত্র কুরআন তো এ সম্পর্কে শুধু এতটুকুই বলেছে—

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

'আর সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ওই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮১]

وَلِسُلَيْمَٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

'আর আমি সুলাইমানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি বাতাসকে যে, সে সকালে একমাসের দূরত্ব (অতিক্রম করে) এবং সন্ধ্যায় এক মাসের দূরত্ব।' [সুরা সাবা]

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

'তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো, যেখানে সে পৌঁছাতে চাইতো।' [সুরা সাদ : আয়াত ৩৬]

৩. জিনসহ অন্যান্য প্রাণীর বশ্যতা স্বীকার

হযরত সুলাইমান আ.-এর রাজত্বের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো– যা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি– একমাত্র মানব সম্প্রদায়ই তাঁর অধীন ছিলো না, বরং জিনজাতিসহ অন্য প্রাণিকুলও তার নির্দেশের অনুগত ছিলো। তাদের প্রত্যেকেই ছিলো হযরত সুলাইমানের রাজকীয় ক্ষমতার আজ্ঞাবহ।

কতিপয় খোদাদ্রোহীকে দেখা যায় যে, 'মুজেযা অস্বীকার করা' ও 'জিনজাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা'-এর আতিশয্যে এ জাতীয় স্থানগুলোর মতো এখানেও হাস্যকর অবান্তর কথার অবতারণা ঘটায়। তারা বলে, এখানে জিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন এক জাতি যারা সেযুগে প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা ও দানবীয় দৈহিক কাঠামোর অধিকারী ছিলো। সুলাইমান আ. ছাড়া অন্য কেউ তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো না। পশু-পাখিদের বশ্যতা সম্পর্কে তারা এ কথা বলে যে, কুরআনে এ সম্পর্কে শুধু হুদহুদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে 'হুদহুদ' পাখি উদ্দেশ্য নয়। বরং এটি ছিলো এক ব্যক্তির নাম। তার দায়িত্ব ছিলো পানি সন্ধান করা। সুদীর্ঘকাল যাবৎ এ প্রথা চলে আসছে যে, লোকেরা যার পূজা করে, নিজ সন্তানদের নাম তার নামে রাখে। বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ নিয়েছে। একে ট্যুটিজম (TOOTISM) বলা হয়।

এ ধরনের ভিত্তিহীন ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণকারীরা হয়তো খোদাদ্রোহিতার উন্মাদনায় কুরআনের অর্থকে বিকৃত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে অথবা কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও দলিলবিহীন দাবির পেছনে পড়ে রয়েছে।

পবিত্র কুরআন 'জিনজাতি' সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারাও মানুষদের মতো আল্লাহর ভিন্ন একটি সৃষ্টি। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা কাসাসুল কুরআনের প্রথম খণ্ডে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এখানে শুধু একটি আয়াতই পেশ করছি, যা আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার সক্ষমতা রাখে। ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

'আমি তো জিন ও মানব সম্প্রদায়কে শুধু এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।'

এই আয়াতে 'জিন'-কে মানবজাতির বাইরে একটি ভিন্ন সৃষ্টিজীব অভিহিত করে উভয়টির সৃষ্টিরহস্য জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই এই আয়াত সামনে রাখার পর যদি কেউ এ কথা বলে যে, 'জিন হলো মানবজাতিরই একটি শক্তিশালী দেহবিশিষ্ট জাতি' তাহলে তা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।

তদ্রূপ যখন হুদহুদের ঘটনায় পবিত্র কুরআন পরিষ্কার তাকে পাখি বলেছে তখন কার এমন দুঃসাহস হয় যে, সে তার বিপরীত অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়? কুরআন বলেছে—

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

'সুলাইমান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? না-কি সে অনুপস্থিত?' [সুরা নামল : আয়াত ২০]

মোটকথা, সুলাইমান আ.-কে মহান আল্লাহ অতুলনীয় সম্মান দান করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব মানব সম্প্রদায়ের বাইরে জিন, প্রাণিজগৎ ও বাতাসের ওপরও সমান কার্যকর ছিলো। এগুলো মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর অনুগত হয়েছিলো। তার কারণ হলো, একবার তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।'

তখন মহান আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁকে এমন এক বিস্ময়কর রাজত্ব দান করেন, যার অনুরূপ তাঁর পূর্বেও কেউ পায় নি এবং তাঁর পরেও কারো ভাগ্যে জোটে নি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ইরশাদ করেন, 'গত রাতে একটি অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে তার ওপর সামর্থ্য দান করেন এবং আমি তাকে ধরে ফেলি। এরপর আমি ইচ্ছে করলাম, সেটিকে মসজিদের স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখবো, যাতে তোমরা দিনের আলোয় সেটিকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়লো আল্লাহর কাছে আমার ভাই সুলাইমানের দোয়া, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ। সে কথা মনে হতেই আমি তাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ছেড়ে দিলাম।'[১]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী فذكرتُ دعوةَ أخِي سليمان-এর ব্যাখ্যা হলো, মহান আল্লাহ আমার মধ্যে সমস্ত নবী-রাসুলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির সমাহার ঘটিয়েছেন, ফলে জিনজাতিকে বশীভূত করার ক্ষমতা আমারও রয়েছে। কিন্তু যখন এটিকে হযরত সুলাইমান

---

১. বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া ও ফতহুল বারি : ৬/৩৫৬

আ.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য অভিহিত করা হয়েছে, তখন এক্ষেত্রে আমি আমার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো সমীচীন মনে করি নি।

বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ

আল্লাহ তাআলা জিনজাতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, কঠিন থেকে কঠিনতর কাজও তারা করে ফেলতে পারে। এ কারণে হযরত সুলাইমান আ. ইচ্ছে করলেন, মসজিদের পুনর্নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকে একটি জনপদ আবাদ করবেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তিনি মসজিদ ও জনপদটিকে মূল্যবান পাথর দিয়ে নির্মাণ করবেন। এ জন্য দূর-দূরান্ত থেকে সুন্দর বড় বড় পাথর নিয়ে আসেন। আর জানা কথা যে, সেই প্রাচীন যুগে যাতায়াতের উন্নত ব্যবস্থা ছিলো না। উপকরণ ছিলো নিতান্তই সীমিত। তা হযরত সুলাইমান আ.-এর আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট ছিলো না। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুধু জিনদের পক্ষেই সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো। এ কারণে তিনি এ কাজে জিনদের ব্যবহার করেন। তাদেরকে দিয়ে দূর থেকে বড় বড় সুদৃশ্য পাথর একত্র করতেন। এভাবেই বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়।

সাধারণভাবে একটি প্রসিদ্ধ কথা হলো, মসজিদে আকসা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগে হয়েছিলো। কথাটি সঠিক নয়। কারণ হলো, বুখারি ও মুসলিমের বিশুদ্ধ মারফু হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার হযরত আবু যর গিফারি রা. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? নবীজি বলেন, মসজিদে হারাম। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করেন, এর পর কোন মসজিদটি অস্তিত্ব লাভ করে? নবীজি বলেন, মসজিদে আকসা। আবু যর রা. পুনরায় জানতে চান, এ দুটির মধ্যবর্তী মেয়াদ কত দিন? নবীজি বলেন, এ দুটোর তৈরির মধ্যবর্তী মেয়াদ চল্লিশ বছর।[২] অথচ মসজিদে হারাম নির্মাতা হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে হযরত সুলাইমান আ.-এর মাঝখানে হাজার বছরেরও বেশি ব্যবধান। এ কারণে হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, যেভাবে হযরত ইবরাহিম আ. মসজিদে হারাম নির্মাণ করেন, যাকে কেন্দ্র করে মক্কা নগরীর গোড়াপত্তন ঘটে, তদ্রূপ হযরত ইয়াকুব (ইসরাইল) আ. মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন, যাকে কেন্দ্র করে আশপাশেই জনপদ গড়ে উঠেছিলো। যার অনেক দিন পর হযরত সুলাইমান

---

[২]. বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া

আ.-এর তত্ত্বাবধানে মসজিদ ও নগরীটির পুনর্নির্মাণ হয়েছিলো। তবে এ কাজে জিনজাতিকে ব্যবহার করার কারণে অতুলনীয় ও দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। তা বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগেও বিশ্ববাসীর বিস্ময়। তারা এ কথা ভেবে হয়রান যে, এত প্রকাণ্ড পাথরগুলো কোত্থেকে আনা হয়েছে, কীভাবে আনা হয়েছে এবং কোন প্রযুক্তির মেশিনের সাহায্যে সেগুলোকে এত উঁচুতে তুলে পরস্পর সংযুক্ত করা হয়েছে?

ওই জিনজাতি শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস-ই নয়, হযরত সুলাইমান আ.-এর নির্দেশে আরো অনেক বৃহদাকারের নির্মাণ কাজ করে দিয়েছে। এমন এমন জিনিস তৈরি করে দিয়েছে, যা ছিলো সেই যুগের প্রেক্ষাপটে বিস্ময়কর। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

'এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্য ডুবুরীর কাজ করতো এবং এ ছাড়া আরও অনেক কাজ করতো। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮২]

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ () يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ()

'কতক জিন তার সামনে কাজ করতো পালনকর্তার নির্দেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাবো। তারা সুলাইমানের ইচ্ছে অনুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করতো। হে দাউদ পরিবার, কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।' [সুরা সাবা : আয়াত ১২-১৩]

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো। জিন, মানুষ ও পক্ষিকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হলো। [সুরা আন নামল : ১৭]

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ () وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ () هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ()

'আর সকল শয়তানকে তার অনুগত করে দিলাম, অর্থাৎ যারা ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকতো শৃঙ্খলে।এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও – এর কোনো হিসেব দিতে হবে না।' [সুরা সাদ : আয়াত ৩৭-৩৯]

হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. বলেন, মহান আল্লাহ হযরত সুলাইমান আ.-কে বিশাল বিশাল নেয়ামত দান করেছেন এবং বলেছেন, এই বিশাল সম্পদের প্রাচুর্য চাইলে ব্যয় করো, দান করো, ধরে রাখো; তোমার ইচ্ছে, এর কোনো হিসেব কাউকে দিতে হবে না। এমন অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও হযরত সুলাইমান আ. এই বিশাল প্রাচুর্য ও ক্ষমতাকে আল্লাহর সৃষ্টির সেবার জন্য 'আল্লাহর আমানত' জ্ঞান করে একটি দানাও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেন নি। বরং তিনি টুকরি তৈরি করে নিজের জীবিকা উপার্জন করতেন।

ইমাম বাইযাবি রহ. এ স্থানে একটি ইসরাইলি বর্ণনা নকল করেছেন যে, জিন জাতি হযরত সুলাইমানের সিংহাসনকে এমন শিল্পিত কারুকার্যখচিত করে তৈরি করেছিলো যে, সিংহাসনের নিচে দুটি বিশালাকার রক্তখেকো সিংহ দাঁড়িয়ে ছিলো। আর দুটি শকুন উপর থেকে ঝুলছিলো। যখন হযরত সুলাইমান আ. সিংহাসনে আরোহণের জন্য সামনে অগ্রসর হয়ে সিংহাসনের কাছাকাছি চলে আসতেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশালকার সিংহ দুটি সামনের দিকে থাবা ছড়িয়ে বসে পড়তো আর সিংহাসনটি নিচু হয়ে যেতো। তিনি সিংহাসনে সমাসীন হতেই সিংহদুটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়তো। আর ভয়ালদর্শন শকুন তার ডানা ছড়িয়ে দিয়ে মাথার ওপর ছায়া দিতো। এভাবে তিনি তাদেরকে দিয়ে পাথরের বিশালাকারের ডেগ বানিয়েছিলেন। বিরাট বিরাট চুলার ওপর সেগুলো রাখা হতো। কিন্তু ডেগগুলো এতটাই ভারী ছিলো যে, সেগুলোকে কোনোভাবে নড়ানো যেতো না। পাথর খোদাই করে অনেক বড় বড় হাউয তৈরি করা হয়েছিলো। বাইতুল মুকাদ্দাস নগরী, মসজিদুল আকসা ও এ সব স্থাপনা নির্মাণ ও কারুকায করতে মাত্র সাত বছর লেগেছিলো।[১]

তাওরাতের বিভিন্ন অংশে এই নির্মাণকাজের বিশদ বিবরণ উঠে এসেছে—

[১]. বাইযাবি, সুরা সাবা

'আর এ কারণেই রাজা সুলাইমান লোকদেরকে বেগার খাটিয়েছিলেন। যে আল্লাহ তাআলার ঘর, (মসজিদে আকসা ও জেরুজালেম নগরী), নিজের রাজপ্রসাদ (সুলাইমানী অট্টালিকা) মুলু নগরী, ও জেরুজালেমের সীমানাপ্রাচীর এবং হাসুর, মাজদু ও জাযের নামক নগরীগুলোও নির্মাণ করেছিলেন।... কাজেই সুলাইমান জাযের ও বাইতে হাওরানের নিম্নাঞ্চল পুনর্নির্মাণ করেন। আর বা'লাত ও দাশতে তাদাম্মুরকে রাজ্যের মধ্যস্থলে... এবং সুলাইমানের শাসনাধীন সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের নগরগুলোও নির্মাণ করেছিলেন। আর তার গাড়ির শহর এবং তার সর্দারদের শহর তৈরি করেছিলেন। এছাড়া সুলাইমানের যত বাসনা ছিলো, সবকিছুই জেরুজালেম, লেবাননসহ শাসনাধীন স্থানগুলোতে নির্মাণ করিয়েছিলেন।'[১]

এভাবে তাওরাতে বিশালাকারের হাউয, বড় ও ভারি ডেগ, ভাস্কর্য এবং সেগুলোর নির্মাণকাজে ব্যবহৃত মূল্যবান পাথরসমূহ সম্পর্কে বিশাল তালিকা দেয়া রয়েছে।[২]

তামার ঝরণা

হযরত সুলাইমানের শখ ছিলো বিশালাকারের প্রাসাদ এবং ইস্পাতদৃঢ় মজবুত কেল্লা তৈরি করা। নির্মিতব্য স্থাপনা যেনো মজবুত হয়, তার প্রতি তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এ জন্য আবশ্যক ছিলো, চুনামাটির মিশ্রণ ব্যবহার না করে ধাতুর মিশ্রণ ব্যবহার করা। কিন্তু এত প্রচুর মিশ্রণ কোথায় পাওয়া যাবে? হযরত সুলাইমান আ. সমস্যাটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-এর এ সমস্যার সমাধান করে দেন এভাবে যে, তাকে গলিত তামার ঝরনা দান করেন।

মুফাসসিরদের মধ্য হতে কারো কারো অভিমত হলো, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-কে তামা গলানোর শক্তি দান করেছিলেন। এটিও তাঁর একটি মুজেযা ছিলো। এর পূর্বে অন্য কেউ তামা গলাতে জানতো না।

নাজ্জার বলেন, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-কে এ নেয়ামত দান করেছিলেন যে, পৃথিবীর যেখানে যেখানে দাহ্য পদার্থের কারণে তামার খনি পানির মতো প্রবাহিত হতো সেই ঝরনাগুলোর খোঁজ হযরত সুলাইমান আ.-

---

১. সালাতিন : ১, অধ্যায় : ৭-৮

২. সালাতিন : ১, অধ্যায় : ৯, আয়াত : ১৫-২০

কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মাটির বুক চিরে এভাবে খনিজ পদার্থের উৎস আবিষ্কার করার কাজটি ইতোপূর্বে আর কেউ করে নি।[৩]

হযরত কাতাদাহ রহ.-এর উদ্ধৃতিতে ইবনে কাসির রহ. নকল করেছেন যে, গলিত তামার এ ঝরনাগুলো ছিলো ইয়ামানে। যেগুলোকে মহান আল্লাহ হযরত সুলাইমান আ.-এর জন্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।[৪]

পবিত্র কুরআন উল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয় নি। কাজেই উল্লিখিত দুটি ব্যাখ্যারই ওই আয়াতগুলোর প্রতিপাদ্য হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পাঠকবর্গ যে কোনো একটির দিকে নিজস্ব অভিরুচির ভিত্তিতে প্রণিধান দিতে পারেন।

তাওরাতে হযরত সুলাইমান আ.-এর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

হযরত সুলাইমান আ.-এর জিহাদি অশ্ববাহিনীর ঘটনা

পবিত্র কুরআনে হযরত সুলাইমান আ. সম্পর্কে একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে—

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ () إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ () فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ () رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ()

'আমি দাউদকে সুলাইমান দান করেছি। সে একজন আল্লাহ-অভিমুখী বান্দা। সে ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল। যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো। তখন সে বললো : আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি– এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করলো।' [সুরা সাদ : আয়াত ৩০-৩৩]

এই আয়াতগুলোর তাফসিরে সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে তিনটি অভিমত বর্ণিত রয়েছে। একটি হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রা.-এর। আর দুটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে। প্রথমটি হযরত হাসান বসরি

---

[৩]. কাসাসুল আম্বিয়া, আরবি : ৩৯৩

[৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/২৮

রহ.-এর সনদে বর্ণিত। অপরটি তালহা ইবনে আবি তালহা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত।

১ম তাফসির

হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রা.-এর তাফসির অনুযায়ী মূল ঘটনাটি হলো, একবার হযরত সুলাইমান আ.-এর জিহাদের অভিযানে বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তিনি নির্দেশ দেন, আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে আসা হোক। ঘোড়াগুলোর তদারকি করতে গিয়ে আসরের নামাযের ওয়াক্ত চলে যায় এবং সূর্যাস্ত ঘটে। তিনি হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, আমি স্বীকার করছি, আল্লাহর স্মরণের ওপর সম্পদের মুহাব্বত প্রাধান্য পেয়েছে। সেই ক্রোধে তিনি তখন ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনলেন এবং আল্লাহর স্মরণের আতিশয্যে সেগুলোকে যবেহ করে ফেললেন। কেননা, এগুলোই ছিলো সেই গাফলতির কারণ।

উল্লিখিত তাফসির অনুযায়ী إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ-এর অর্থ হবে, নিঃসন্দেহে আমি পালনকর্তার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে মালের মুহাব্বতে পড়ে গেছি। আর تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ -এ تَوَارَتْ -এর সর্বনামটি ফিরবে সূর্যের দিকে। যেটি বাক্যে উহ্য আছে। অর্থাৎ توارت الشمس بالحجاب : সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। আর فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ-এ مسح এর অর্থ হবে ضرب অর্থাৎ সেগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করলেন।

ইবনে কাসির রহ. উল্লিখিত অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, অধিকাংশ পূর্বসূরিদের এটাই অভিমত। হযরত সুলাইমান আ.-এর উল্লিখিত কাজটি স্বেচ্ছায় ঘটে নি। বরং এ ধরনের একটি ঘটনা খন্দক যুদ্ধের সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ঘটেছিলো যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। তখন নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যাস্তের পর কাযা পড়েন।[১] আর যখন হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর স্মরণের ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলোকে যবেহ করে ফেলেন, তখন মহান আল্লাহ তাঁর ওপর বিশাল নেয়ামত বর্ষণ করেন যে, বাতাসকে তার জন্য বশীভূত ও অনুগত করে দেন।[২]

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪র্থ খণ্ড। সুরায়ে সাদ, তারিখে ইবনে কাসির : ২/২৫

২. প্রাগুক্ত

২য় তাফসির

হযরত হাসান বসরি রহ.-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, মূল ঘটনাটি ছিলো, জিহাদের অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে হযরত সুলাইমান আ. ঘোড়াগুলোকে হাজির করার নির্দেশ প্রদান করেন। যথারীতি হাজির করা হয়। এরপর প্রথম তাফসির অনুযায়ী যা ঘটার ঘটে যায়, তখন হযরত সুলাইমান আ. সেগুলোকে ফিরিয়ে এনে সেগুলোর পা ও গর্দানের ওপর মৃদু প্রহার করে বললেন, আগত সময়ে তোমরা যেনো আমার আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার কারণ না হও।[৩]

এই তাফসির অনুযায়ী আয়াতে উল্লিখিত مسح শব্দের অর্থ, মৃদু প্রহার করা। কাজেই তখন উদ্দেশ্য হবে, যদিও জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকাটাই গাফলতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সত্ত্বেও হযরত সুলাইমান আ. বাহ্যিক কারণ হিসেবে ঘোড়াগুলোকেই চিহ্নিত করে সেগুলোর সঙ্গে এই আচরণ করেছেন। যে আচরণ থেকে সার্বিকভাবে দুঃখের প্রকাশ ঘটে। এটাও বুঝে আসে যে, তিনি সেগুলোকে মূক প্রাণী মনে করে সেগুলোকে নিজের ক্রোধ ঝারার পাত্র বানাতে চান নি, বরং তিনি শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে চেয়েছে।

৩য় তাফসির

আলি ইবনে আবি তালহার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে তৃতীয় যে তাফসিরটি বর্ণিত রয়েছে তা প্রথম দুটি তাফসির থেকে আলাদা। সেখানে নামায কাযা হওয়া, সূর্যাস্ত যাওয়া, ঘোড়াগুলোকে যবেহ করা, এর কোনোটাই নেই। বরং ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, জিহাদের একটি অভিযানে একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত সুলাইমান আ. জিহাদের ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে নিয়ে আসার আদেশ করলেন। তিনি ঘোড়ার বংশ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সবকটি-ই দ্রুতগামী ও দৃষ্টিনন্দন। সংখ্যায়ও প্রচুর। এ কারণে তিনি খুব খুশি হন এবং বলেন, এই ঘোড়াগুলোর জন্য আমার এ ভালোবাসা এমন বস্তুজাগতিক ভালোবাসা, যা আমার পালনকর্তার স্মরণেরই একটি অংশ। হযরত সুলাইমান আ. এমন চিন্ত করছিলেন। এর মধ্যেই ঘোড়াগুলো আস্তাবলের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। তিনি সেগুলোর দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি উঠালেন, ততক্ষণে সেগুলো দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। তিনি সেগুলোকে ফিরিয়ে আনতে বললেন। সেগুলো

---

[৩]. ফাতহুল বারি : ৬/২৫৬

ফিরিয়ে আনার পর তিনি ভালোবাসা ও যুদ্ধের বাহনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে সেগুলোর পাদদেশ ও গলদেশে হাত বুলিয়ে দিলেন। স্নেহ করলেন ও মমতা দিলেন।

উল্লিখিত তাফসির অনুযায়ী إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ[1] حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ-এর অর্থ হবে, 'নিঃসন্দেহে আমার বস্তুর প্রতি ভালোবাসা (যুদ্ধের ঘোড়ার প্রতি ভালোবাসা) আল্লাহর স্মরণেরই অংশ। আর تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এ- تَوَارَتْ -এর সর্বনামটি ফিরবে صافنات الجياد এর দিকে। অর্থাৎ যখন ঘোড়াগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। তখন شمس-কে উহ্য মানার প্রয়োজন পড়বে না। আর فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ -এ مسح—এর অর্থ হবে 'স্পর্শ করা ও হাত ফিরিয়ে দেওয়া'। যা তার সাধারণ অর্থ। অভিধানে এ অর্থটিই প্রসিদ্ধ।[2]

ইবনে জারির তাবারি ও ইমাম রাযি রহ. এ তাফসিরটিকেই প্রণিধানযোগ্য ও সত্যের নিকটবর্তী অভিহিত করেছেন। তারা বলেন, ঘোড়ার সংখ্যা হাজারেরও অধিক ছিলো এবং সেগুলোকে জিহাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। উপরন্তু এটিও একটি যৌক্তিক কথা যে, যদি তাঁর নামায কাযা হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে প্রাণীদের কোনো দোষ নেই যে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এই বিষয়গুলো সামনে রেখে চিন্তা করা হলে স্পষ্টতই বুঝে আসে যে, হযরত আলি রা.-এর প্রতি যে ব্যাখ্যাটিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তা সঠিক হতে পারে না।

ফয়সালা

বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও মুফাসসিরদের অভিমতসমূহ জানার পর আমাদের কাছে ইবনে জারির ও ইমাম রাযি-এর রায়কেই প্রণিধানযোগ্য ও সত্যের নিকটবর্তী মনে হয়েছে। কারণ হলো, প্রথমত এখানে কোনো কিছু উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ছে না। দ্বিতীয়ত, হযরত সুলাইমান আ.-এর দিকে এমন কোনো কাজকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজন হচ্ছে না, যা যুক্তির বিচারে অসম্ভব মনে হয়। এক্ষেত্রে ইবনে কাসির রহ. ইবনে জরিরের আপত্তির যে উত্তর দিয়েছেন, সেটিকেও অনেক দূরবর্তী ব্যাখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু মনে হচ্ছে না। কেননা, একজন উচ্চশ্রেণির নবীর ঘটনায় কোনো শক্তিশালী কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, যার প্রেক্ষিতে[3] দশ অথবা বিশ হাজার ঘোড়াকে এভাবে যবেহ

---

[1]. أحببت এর অর্থ হলো, أردت الحُبَّ। দেখুন, আল বাহরুল মুহিত : ৭/৩৯৬

[2]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৫৬, তারিখে ইবনে কাসির : ২/২৫

[3]. ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মাঝে দশ হাজার ও বিশ হাজার; উভয়

করে ফেলা হবে। যদি এ উত্তর দেয়া হয় যে, সম্ভবত তাদের সমাজে এ ধরনের কাজ প্রচলিত ও পছন্দনীয় ছিলো, তবে এটি একটি প্রমাণহীন উত্তর ছাড়া কিছু নয়। ইবনে কাসির রহ.-এর এই বক্তব্য 'যখন হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর স্মরণের ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলোকে যবেহ করে ফেলেন, তখন মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই বিশাল নেয়ামত বর্ষণ করেন যে, বাতাসকে তার জন্য বশীভূত করে দেন।' এটি একটি চমৎকার কথা; কিন্তু পবিত্র কুরআনের আলোচনার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায় না। কেননা, আলোচিত ঘটনাটি একটি পৃথক ঘটনা। যাতে পবিত্র কুরআন কোথাও সামান্যতম এমন ইঙ্গিতও করে নি, যার দ্বারা এই ঘটনার সঙ্গে বাতাসকে বশীভূত করার সম্পৃক্ততার আভাস মেলে। অথচ পবিত্র কুরআনের আলোচনার ধরন অনুযায়ী আলোচিত আয়াতে এ কথা আসা দরকার ছিলো যে, সুলাইমান আমাকে খুশি করার জন্য এমনটি করেছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এ পুরস্কার দান করলাম যে, খোদ বাতাসকেই তার বশীভূত করে দিলাম। অথচ এর বিপরীতে বাতাসকে বশীভূত করার বিষয়টিকে পৃথক একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে পেশ করা হয়েছে। তা ছিলো হযরত সুলাইমান আ.-এর পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট। হযরত সুলাইমান যখন আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন ক্ষমতা দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কেউ পায় নি। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন যে, জিন, প্রাণিজগৎ ও বাতাসকে তার অনুগত করে দিলেন।[৪]

মোটকথা, صافنات الجياد এর ঘটনার পর এমনটি পাওয়া যায় নি যে, হযরত সুলাইমান আ. ঘোড়ায় চড়া ছেড়ে দিয়েছেন বা যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার ব্যবহার ত্যাগ করেছেন। জিন ও বাতাসকে অনুগত করার সঙ্গে ঘটনারটির সম্পৃক্ততার কোনো সূত্রও কোথার থেকে পাওয়া যায় নি। আয়াতের কোথাও شمس তথা সূর্যের উল্লেখ নেই। আর একসঙ্গে এত প্রচুর সংখ্যক উৎকৃষ্ট ঘোড়া যবেহ করা একটি পছন্দনীয় কাজ; এ কথাও কোনো সনদে প্রমাণিত নেই। উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর অভিমতটিই প্রণিধানযোগ্য ও সত্যের নিকটবর্তী।[৫]

রেওয়ায়েতেই পেশ করেছেন।

[৪]. সুরা সাদ

[৫]. হামদানির বক্তব্য অনুযায়ী যদি أحببت এর অর্থ হলো, أردت المحبة নেয়া হয়, তাহলে عن শব্দটি من এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

হযরত সুলাইমান আ.-এর পরীক্ষার ঘটনা

সুরা সাদে হযরত সুলাইমান আ.-এর পরীক্ষা ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অবতারণা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এভাবে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ () قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ () فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

'আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে আল্লাহ-অভিমুখী হলো। সুলাইমান বললো : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। তখন আমি বাতাসকে তার বশীভূত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো, যেখানে সে পৌঁছাতে চাইতো।' [সুরা সাদ : আয়াত ৩৪-৩৬]

আয়াতগুলোতে এ কথা স্পষ্ট করা হয় নি যে, হযরত সুলাইমান আ.-কে যে পরীক্ষায় ফেলা হয় তার ধরন কী ছিলো। শুধু এতটুকু ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, তার সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ ফেলে রাখা হয়েছিলো। হাদিস শরিফেও এ ব্যাপারে কোনো বিশদ বিবরণ নেই। কাজেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসিরে মুফাস্‌সিরিনে কেরাম দু-ধরনের পথ অবলম্বন করেছেন

১. প্রথম পথ হলো, অনুমান ও ধারণার আশ্রয় নিয়ে আমাদের কোনো রায় দাঁড় করানো উচিত হবে না। শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখাই উচিত হবে যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি হযরত সুলাইমান আ.-কে কোনো পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। এ পরীক্ষায় দুটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো, তাঁর সিংহাসন। আর অপরটি হলো, সেই সিংহাসনের ওপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ রাখা। এর বাইরে কোনো বিশদ বিবরণ জানা নেই। তবে ঘটনার শেষাংশে হযরত সুলাইমান আ. একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর মতোই আল্লাহর দরবারের অভিমুখী হয়েছিলেন। এসময় তিনি প্রথমত মাগফিরাত প্রার্থনা করেন এবং এর পর এমন রাজত্বের জন্য দোয়া করেছিলেন, যা হবে অদ্বিতীয় ও দৃষ্টান্তহীন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই দোয়া কবুল করেন। এরপর তার জন্য ঘোষণা করেন—

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ

'নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। [সুরা সাদ : আয়াত ৪০]

আলোচ্য আয়াতের তাফসিরের ক্ষেত্রে উল্লিখিত পথ অবলম্বন করেছেন হাফেয ইমাদুদদিন ইবনে কাসির, ইবনে হাযাম রহ.-সহ অন্য শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও মুফাসসিরগণ।

২. দ্বিতীয় পথ হলো, উল্লিখিত ঘটনার বিবরণ ও আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য কোনো পথ বের করা হোক এবং তার অস্পষ্টতার সমাধানে উপায় পেশ করা হোক।

সেই সমাধান বের করার জন্য মুফাসসিরগণ যেসব তাফসির পেশ করেছেন, তন্মধ্য হতে দুটি তাফসির উল্লেখযোগ্য। একটি ইমাম রাযি-এর পক্ষ থেকে, অপরটি কতিপয় মুহাদ্দিসিনে কেরামের পক্ষ থেকে বর্ণিত।

ইমাম রাযি রহ.-এর ব্যাখ্যার সারাংশ হলো, হযরত সুলাইমান আ. একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অবস্থা তখন এতটা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছিলো যে, তাঁকে সিংহাসনে এনে বসানো হলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, তাঁর দেহ নিষ্প্রাণ। এরপর মহান আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ প্রথমে উচ্চ মর্যাদাশীল নবীদের মতো মাগফিরাত প্রার্থনা করেন, নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এরপর দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ, আমাকে অদ্বিতীয় রাজত্ব দান করুন।[১]

রাযি রহ.-এর উল্লিখিত ব্যাখ্যা[২] অনুযায়ী وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ -এ 'ফেতনা' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ভীষণ অসুস্থতা। আর وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا -এ القاء جسد (দেহ নিক্ষেপ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অসুস্থ অবস্থায় হযরত সুলাইমানের নিষ্প্রাণ দেহের মতো সিংহাসনে পড়ে থাকা। আর ثُمَّ أَنَابَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সুস্থতার দিকে ফিরে আসা, সুস্থ হয়ে পড়া। যেনো এ পরীক্ষার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত সুলাইমান আ.-কে عين اليقين তথা প্রত্যক্ষ সত্যের স্তরে নিয়ে এ কথা বুঝানো যে, তাঁর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে সময় শুধু তাঁর শুধু নেতৃত্ব-ই নয়, বরং প্রাণ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় ছিলো না। কাজেই তিনি যেনো উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর মতোই এ সময় আল্লাহর দরবারে

---

[১]. তাফসিরে কাবির, সুরা সাদ

[২]. প্রাগুক্ত

নত হন এবং বিনম্রতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করে, মাগফিরাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে তাঁর মর্যাদাকে উচ্চ থেকে অধিক উচ্চতায় উন্নীত করেন।

মুহাদ্দিসিনে কেরামের কেউ কেউ এই আয়াতসমূহের বিবরণে বলেন, একবার হযরত সুলাইমান আ. ইচ্ছে করলেন, আমি আজকের রাতে আমার স্ত্রীদের সবার সঙ্গে সঙ্গম করবো। তাহলে আমার প্রত্যেক স্ত্রীর একজন করে ছেলে জন্ম নেবে আর তারা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ হবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে যান। নবীর এই কাজটি আল্লাহর পছন্দ হয় নি। যার কারণে তিনি হযরত সুলাইমান আ.-এর উল্লিখিত দাবিকে এভাবে ভুল সাব্যস্ত যে, সকল স্ত্রীর মধ্য হতে শুধু একজনই একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তিনি যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তখন জনৈক সেবিকা সেটিকে তাঁর সামনে পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্বিৎ ফিরে পান। তিনি বুঝতে পারেন যে, আল্লাহর কাছে সোপর্দ না করে এবং ইনশাআল্লাহ না বলে ব্যক্তিগত ভাবনার ওপর এতটা নির্ভর করার পরিণতি হিসেবে এমনটি ঘটেছে। তিনি আল্লাহর দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নেন। মাগফিরাত কামনা করেন এবং সেই দোয়া প্রার্থনা করেন, যার কথা পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাঁদের তাফসিরের দলিল হিসেবে বুখারি ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিস পেশ করেন। এটিকে তাঁরা উল্লিখিত তাফসিরের সনদ অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির আবুস সাউদ ও সাইয়িদ মাহমুদ আলুসি রহ. উল্লিখিত অভিমতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

'হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর কাছে যাবো। যাতে তাঁদের মধ্য হতে প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে ছেলে প্রসব করে, যারা হবে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ। এসময় তাঁর জনৈক পারিষদ তাঁকে বললো, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু

---

১. রুহুল মা'আনি : খণ্ড : ২৬

তিনি সেটি বললেন না। যার পরিণতিতে এমন ঘটলো যে, তাঁর কোনো স্ত্রী-ই গর্ভবতী হলো না। শুধু একজন স্ত্রী এমন একটি সন্তান প্রসব করলো, যে ছিলো অপূর্ণাঙ্গ। শরীরের এক পাশ নেই। এরপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন তাহলে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রী থেকে একজন করে আল্লাহর পথের মুজাহিদ জন্ম নিতো।[২]

ফয়সালা

এ দুটি তাফসিরে কিছু কথা থেকে যায়। প্রথম ব্যাখ্যা, যেটিকে ইমাম রাযি. রহ. গ্রহণ করেছেন, সেটি সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর ব্যাখ্যা। সেখানে আয়াতগুলোর এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছে, যা অনেক দূরবর্তী ব্যাখ্যা ছাড়া কিছু নয়। এতটুকু না হয় মানার মতো যে, আল্লাহর দরবারের নৈকট্যশীলদের জন্য কখনো কখনো অসুস্থতাও পরীক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু 'হযরত সুলাইমানের সিংহাসনের ওপর দেহ নিক্ষেপ' দ্বারা প্রচণ্ড দুর্বলতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ উদ্দেশ্য নেওয়া সহজ বোধগম্যতার পরিপন্থী। আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, তাঁর সিংহাসনের ওপর কোনো কিছু ফেলা হয়েছিলো; হযরত সুলাইমানের পরীক্ষার সঙ্গে সেটির সংশ্লিষ্টতাও ছিলো। দ্বিতীয়ত أَنَابَ শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআন বিভিন্ন স্থানে 'মাগফিরাত কামনা ও নিজের দাসত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহমুখী হওয়া' উদ্দেশ্য নিয়েছে। কাজেই এখানে 'সুস্থতা লাভ' অর্থ নেওয়া পছন্দনীয় নয়।

তদ্রূপ মুহাদ্দিসিনে কেরামের কেউ কেউ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে পথে আবুস সাউদ ও সাইয়িদ মাহমুদ আলুসি রহ. হেঁটেছেন, সেটিও আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসির নয়। কারণ হলো, বুখারি শরিফসহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবের যেখানেই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তার কোনো একটি সনদে এমন কোনো কথা নবীজি থেকে বা হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নেই যে, উল্লিখিত ঘটনাটি আমাদের আলোচিত আয়াসমূহের তাফসির। এমনকি এদিকে ইশারা পর্যন্ত নেই। বরং এ হাদিসটি হযরত সুলাইমান আ.-এর একটি স্বতন্ত্র ঘটনা উল্লেখ করেছে। যেভাবে হযরত বুখারি রহ. উল্লিখিত অধ্যায়ে তাঁর আরো অনেক ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। যেমন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছন, হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগে দুই মহিলা একসঙ্গে সফর করছিলো। দু-জনের

---

[২]. বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া

সঙ্গেই ছিলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। পথিমধ্যে একজনের শিশুকে চিতাবাঘ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলো। এখন যে শিশুটি রয়ে গেছে, তাকে নিয়ে দুই নারীই ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলো। তারা দু-জনই দাবি করলো যে, এটি তার নিজের শিশু। চিতাবাঘ অন্যজনের শিশু নিয়ে গেছে। হযরত দাউদ আ.-এর কাছে মামলাটি উত্থাপন হলে তিনি 'বিবাদ নিরসনের নীতিমালা' অনুযায়ী উভয় পক্ষের বৃত্তান্ত শুনে বড়জনের পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। কেননা, বড়জনের দখলেই শিশুটি ছিলো। আর ছোটজন তার দখলের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য পেশ করতে পারছিলো না। যখন এই দুই মহিলা ফেরার পথে হযরত সুলাইমান আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাদের মামলার বৃত্তান্ত শোনলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো। এই শিশুকে দুখণ্ড করে তাদের দু-জনকে একটি করে খণ্ড দিয়ে দাও। রায় শুনে বড়জন নিশ্চুপ ছিলো কিন্তু ছোটজন হাউ-মাউ করে কেঁদে-কেটে একাকার করে ফেললো। বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে এ বাচ্চাকে দু-টুকরো করবেন না। আমি এটিকে বড়জনের কাছে দিয়ে আমার অধিকার প্রত্যাহার করছি। তখন সকলেরই বিশ্বাস হলো, এ শিশুটি ছোটজনের। বড়জন একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তখন ছোটজনের হাতে শিশুটিকে সোপর্দ করা হলো।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুলাইমান আ.-এর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও গভীর মেধা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঘটনাটি বলেছিলেন। এভাবে হযরত সুলাইমান আ. ও তাঁর স্ত্রীদের ঘটনা এজন্য শুনিয়েছিলেন যে, উম্মত যেনো এর থেকে শিক্ষা অর্জন করে। তারা যদি তাদের কাজকর্মে কল্যাণ ও বরকত কামনা করে তাহলে যেনো সে কাজটি করার সংকল্প ব্যক্ত করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' অবশ্যই বলে নেয়। সম্ভবত এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ যখন ওই ঘটনাটি শুনাতেন, হযরত সুলাইমান আ.-এর পুণ্যবতী স্ত্রী ও বাঁদির সংখ্যা এক হাজার বলতেন। এ কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনার মূল বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়ে বলেন, তাদের সংখ্যা ষাট জন। তবে কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, একশো জন। যার মধ্য হতে কয়েকজন ছিলেন স্ত্রী। আর অন্যরা হচ্ছেন তার বাঁদি।[১]

মোটকথা, আলোচিত বর্ণনাটি উপদেশ ও শিক্ষামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বিবৃত

---

[১]. নাজ্জার এ স্থানের তাফসিরে তৃতীয় একটি পথ অবলম্বন করেছেন। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, সেটি অন্ধের তীর ছোঁড়া বৈ অন্য কিছু নয়। বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এর জন্য কাসাসুল আম্বিয়া : ৩৯২ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতের তাফসিরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই আমাদের আলোচনার সারাংশ হলো, ইমাম রাযিসহ কতিপয় মুহাদ্দিসিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা হযরত সুলাইমান আ.-এর পরীক্ষা ও তাঁর সিংহাসনের ওপর একটি দেহ নিক্ষেপের ঘটনার সমাধান দিতে সক্ষম নয়। যদিও আয়াতসমূহে উল্লেখিত দুটি বিষয় সংক্ষেপে বলা হয়েছে, কিন্তু এর থেকে কী শিক্ষা ও উপদেশ অর্জিত হয়, তা কিন্তু বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা পেশ করার পেছনে এটাই উদ্দেশ্য। কাজেই আমাদের কর্তব্য হলো, সেই উপদেশকে ধারণ করে তার থেকে অর্জিত শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপের ওপর বিশ্বাস রাখা। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তির হৃদয় সেই সংক্ষিপ্ত ঘটনায় তৃপ্তি লাভ না করে, তাহলে তার জন্য ইমাম রাযি রহ.-এর পেশ করা ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই অধিক সঙ্গত।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত তাফসির ছাড়াও এমন অনেক বর্ণনা তাফসিরের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ইসলামি বর্ণনার কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। নিঃসন্দেহে সেগুলোর সবক'টি ইহুদিদের তৈরি বানোয়াট গাল-গল্প, ইসরাইলি রেওয়ায়াত। সেগুলোকে রেওয়ায়েত বললেও রেওয়ায়েত শব্দের অপমান হয়।

সেই অলীক বর্ণনাগুলোর সারকথা হলো, কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-এর সিংহাসনের ওপর শয়তানকে দখলদার বানিয়ে দেন। এর নেপথ্যে অনেকগুলো কারণের কথা বলা হয়। যার একটি কারণ হলো, হযরত সুলাইমানের এক স্ত্রী ছিলো মূর্তিপূজারী। তার নাম ছিলো আমিনা। সে তার পিতার মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। এ কারণে আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আ.-কে এ শাস্তি দেন যে, যতটা সময় আমিনা তার গৃহে মূর্তিপূজা করতো, ততটা সময় তিনি সিংহাসন থেকে বঞ্চিত থাকতেন। হযরত সুলাইমানের একটি আংটির ওপর ইসমে আযম লেখা ছিলো। আংটিটি তাঁর বাঁদি জারাদাহ-এর মাধ্যমে শয়তানের হাতে চলে যায়। তখন শয়তান হযরত সুলাইমানের আকৃতি ধারণ করে সিংহাসনের ওপর বসে রাজত্ব করতে থাকে। মূর্তিপূজার নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর আংটিটি শয়তানের হাত থেকে সমুদ্রে পড়ে যায়। একটি মাছ এসে সেটি গিলে ফেলে। হযরত সুলাইমান আ. ওই মাছটি শিকার করে তার পেট ফেড়ে আংটি বের করেন। এভাবে তিনি তার রাজত্ব ফিরে পান।

তাওরাতে 'সালাতিন' অধ্যায়ের একাদশ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনার কাছাকাছি একটি গল্প রয়েছে। সেখানে বিবিদের মন রক্ষার্থে হযরত সুলাইমান আ.-এর মূর্তিপূজার কথাও বর্ণিত রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।

উল্লিখিত ঘটনায় একজন উচ্চশ্রেণির নবীর দিকে যে গাল-গল্প ও অবান্তর কথামালা জুড়ে দেয়া হয়েছে, তা পড়ে একজন অতি সাধারণ মানুষও সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে এ ধরনের বানোয়াট গল্পের দূরতম সম্পর্কও নেই। এ কারণেই প্রখ্যাত তাফসির বিশারদ ইবনে কাসির রহ. সেই বর্ণনাগুলো সম্পর্কে ফয়সালা জানিয়ে লিখেছেন—

ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثارا كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الاسرائيليات وفي كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا ههنا على مجرد التلاوة. — البداية والنهاية

ইবনে জারির ও ইবনে হাতেমসহ অন্য মুফাসসিরীনে কেরাম এখানে পূর্বসূরিদের বরাতে অনেকগুলো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশগুলো বা সবকটিই ঈসরাইলি সূত্রে প্রাপ্ত। যার অনেকগুলোয় চরম নিন্দনীয় কথা রয়েছে। আমরা আমাদের তাফসিরের কিতাবে সে বিষয়ে সতর্ক করেও দিয়েছি। এখানে শুধু পবিত্র কুরআনে বিবৃত ঘটনা তেলাওয়াত করাকেই যথেষ্ট মনে করেছি। -আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/৬২

ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما - إن صح عنه - من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في هذا السياق منكرات

কিন্তু জানা কথা যে, যদি উল্লিখিত বর্ণনার সম্পৃক্ততা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে যুক্ত করাটা সঠিকও হয়ে থাকে, তারপরও শেষ কথা হলো, এটি তিনি আহলে কিতাব থেকে পেয়েছেন। যাদের একদল হযরত সুলাইমান আ.-কে নবী বলেই স্বীকার করে না। কাজেই এটি সুস্পষ্ট কথা যে, তারা হযরত সুলাইমানকে নিয়ে মিথ্যাচার করেছে। আর এ কারণেই তাদের বর্ণনায় অনেক নিন্দনীয় কথা উঠে এসেছে। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৬

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف. كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب

এই দীর্ঘ কাহিনি আমাদের পূর্বসূরিদের একদলের বরাতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, যায়দ ইবনে আসলাম প্রমুখ। তাঁদের ছাড়াও পূর্বসূরিদের আরো একটি দল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত ঘটনাগুলোর আদ্যোপান্ত আহলে কিতাবদের বানোয়াট গল্পমালা থেকে সংগৃহীত। -তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৩৬

ইবনে কাসির রহ. ছাড়াও ইমাম রাযি তাঁর তাফসিরে, ইবনে হাযাম 'আল ফসল'-এ, কাযি আয়াদ রহ. 'শিফা'য়, শায়খ বদরুদ্দিন আইনি রহ. বুখারি শরিফের ব্যাখ্যায় এবং অন্য শীর্ষস্থানীয় মুহাককিক, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলোকে বানোয়াট, উদ্ভট ও আহলে কিতাবদের বিষবাষ্প অভিহিত করে ইসলামি রেওয়ায়েতের আঁচলকে তার থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

হযরত সুলাইমান আ.-এর সৈন্যবহর ও উপত্যকার পিঁপড়া

বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা 'পাখির সঙ্গে কথোপকথন' অধ্যায়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম যে, মহান আল্লাহ হযরত সুলাইমান আ.-কে বিভিন্ন প্রাণীর ভাষা বুঝার জ্ঞান দান করেছিলেন। তারই সূত্র ধরে পবিত্র কুরআন প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা –পিপীলিকার ঘটনা– এভাবে বর্ণনা করেছে :

একবার হযরত সুলাইমান আ. জিন, মানুষ ও প্রাণীদের বিশাল সৈন্যবহর সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এত বিশাল ও বিপুল সৈন্য-সামন্তের উপস্থিতি সত্ত্বেও কারো এ হিম্মত ছিলো না যে, সে তার নিজের অবস্থান ও স্তরের বিপরীতে গিয়ে আগে-পিছে যাওয়ার বিশৃঙ্খলা করার দুঃসাহস দেখাবে। সৈন্যবহরের প্রতিটি সদস্য একান্ত অনুগত সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো হযরত সুলাইমানের ভয়ে নিজ নিজ অবস্থান মেনে অগ্রসর হচ্ছিলো। এক পর্যায়ে সৈন্যবহরটি এমন একটি উপত্যকায় পৌছলো যেখানে প্রচুর পিপীলিকা ছিলো। গোটা উপত্যকাটি ছিলো পিঁপড়েদের বাসস্থান। তখন পিপীলিকাদির সর্দার এই বিশাল সৈন্যবহর দেখে স্বজাতিকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলো, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' অর্থাৎ তাদের পদাতিক বাহিনীর পদতলে পড়ে অথবা ঘোড়ায় পিষ্ট হয়ে তোমাদের দফা-রফা হতে পারে। হযরত সুলাইমান আ. পিপীলিকা সর্দারের নির্দেশ শুনে হেসে ফেললেন এবং তার বিজ্ঞোচিত নির্দেশের জন্য বাহ্‌বা দিলেন। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে—

contents

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ () وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ () وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ () حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ () فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ()

'আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' সুলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষিকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো। – জিন, মানুষ ও পক্ষিকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হলো। যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো, তখন এক পিপীলিকা বললো, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। তার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছো এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।' [সুরা আন-নামল : আয়াত ১৫-১৯]

আমরা নির্দেশদানকারী পিপীলিকাকে পিপীলিকাদির সর্দার বলেছি। তার কারণ হলো, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, প্রাণিজগতের মধ্যে মৌমাছি ও পিপীলিকাদির জীবনযাপন-ব্যবস্থাপনা এতটাই সুন্দর যে, সেটিকে 'প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা' বললে অত্যুক্তি হবে না। বরং কতিপয় বুদ্ধিজীবীরা তো এ পর্যন্ত দাবি করেন যে, মানবজাতি এ দুটি প্রাণীর ব্যবস্থাপনা দেখেই তাদের ব্যবস্থাপনা শিখেছে। দাবিটি সংশয়যুক্ত হলেও এতটুকু মেনে নিতে আপত্তি থাকতে পারে না যে, এ দুটি প্রাণীর জীবনব্যবস্থা

খুবই চমৎকার। এই সত্য স্বীকার করে নেয়ার পর এ কথা খুব সহজেই বলা যেতে পারে যে, সেই নির্দেশ দানকারী পিপীলিকাটি ছিলো সেই পিপীলিকাদির সর্দার।

পিপীলিকাদির উপত্যকাটি কোথায় অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকগুলো স্থানের নাম বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হলো, সেটি 'আসকালান'-এর আশপাশে অবস্থিত। যেমনটি ইবনে বতুতা বলেছেন। অথবা বাইতে হিবরুন ও আসকালানের মাঝামাঝি অবস্থিত, যেমনটি ইয়াকুত হামাবি হতে বর্ণিত। সাধারণ মুফাসসিরগণ তা শামদেশে বলে উল্লেখ করেছেন।

এই প্রশ্ন ছাড়াও এখানে আরো কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন, নির্দেশদাতা পিপীলিকাটির নাম কী ছিলো? সেটি পিঁপড়াদের কোন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত? তার শারীরিক গড়ন-গঠন কেমন ছিলো? ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর বিভিন্ন ইসরাইলি রেওয়ায়েত ও ইহুদিদের গালগল্পের আলোকে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এ সবগুলো আলোচনাই নিষ্ফল, অবান্তর ও সূত্রহীন। পবিত্র কুরআন ও রাসুলের হাদিসের কোথাও এ জাতীয় অনর্থ কথার নাম-গন্ধ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ, নওফে বাক্কালি বলেন, সেই উপত্যকার পিঁপড়েদের আকৃতি ছিলো চিতাবাঘের সমান। অথচ পবিত্র কুরআন স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে যে, সেগুলোর আকৃতি এতটাই ক্ষুদ্র ছিলো যে, তাদের সর্দারকে বলতে হয়েছিলো, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' তার এ কথা তখনই সঠিক হবে, যখন সেই উপত্যকার পিপীলিকাগুলো তার স্বজাতীয় অন্যান্য পিঁপড়ের মতো এতটাই ক্ষুদ্রাকৃতির হবে যে, কারো পায়ের তলে পড়লে সে বুঝতেও পারবে না।

উল্লিখিত ঘটনার অবতারণা দ্বারা পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য হলো, যখন এর পূর্বের আয়াতগুলোতে কুরআন এ কথা বলেছে যে, মহান আল্লাহ হযরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামকে 'পাখিদের সঙ্গে কথপোকথন'-এর বিদ্যা দান করেছিলেন এবং এটি তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতীক, তখন কুরআন সঙ্গত মনে করেছে যে, এ সম্পর্কিত এক-দুটি ঘটনা পেশ করা হোক, যাতে পাঠকবর্গের এ নিয়ে কোনো সংশয় না থাকে এবং তাদের এ প্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞানও লাভ হয় যে, পবিত্র কুরআন যেভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছে, তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয় যে, তাঁদের সেই বিদ্যাটি পার্থিব সাধারণ

বিদ্যার মতো ছিলো না। বরং সেটি ছিলো, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দুই মহান নবীর জন্য বিশেষ উপহার তথা মুজেযা। তাই প্রথম ঘটনা হিসেবে উপত্যকার পিপীলিকাদির ঘটনা পেশ করেছে যে, হযরত সুলাইমান আ. একটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণীর কথা শুনে বুঝে ফেলেছেন, যেভাবে একজন মানুষ অপর মানুষের কথা অনায়াসে শোনে ও বোঝে। তা ছাড়া এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যখন হযরত সুলাইমান আ. সেই বিদ্যার চাক্ষুষ প্রকাশ দেখলেন ও মর্যাদার গভীরতা অনুধাবন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন উচ্চশ্রেণির নবীর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে মহান আল্লাহর দানকরা সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

ঘটনাটির তাৎপর্য এভাবেও অনুভূত হয় যে, যে সুরায় ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে আল্লাহ তাআলা সেই সুরাটির নাম রেখেছেন 'সুরা নামল'।

আহমদ যকি পাশা মিসরি তাঁর এক নিবন্ধে আলোচিত আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে নাম্‌ল বা পিপীলিকা দ্বারা মানুষের বড় জটলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই উপত্যকায় পিপীলিকার মতো অসংখ্য মানুষ গিজগিজ করছিলো। কাজেই আশঙ্কা হচ্ছিলো, হযরত সুলাইমান আ.-এর সৈন্যবহর তাদেরকে পদদলিত করে ফেলতে পারে। সত্য হলো, যকি পাশার এই ব্যাখ্যা সত্যাশ্রিত নয়। বরং এতে কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটেছে। কারণ, আয়াতে হযরত সুলাইমান আ. ও তার সৈন্যবহর সম্পর্কে এ মন্তব্য বর্ণিত রয়েছে, وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ, 'এমন যেনো না হয় যে, তারা তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে অথচ তারা বুঝতেও পারবে না যে, তোমাদের প্রাণের ওপর দিয়ে কী বয়ে গেছে।' তাহলে কীভাবে নাম্‌ল দ্বারা মানুষের বড় জটলা উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হয়? উপরন্তু উল্লিখিত আয়াতের পূর্বাপর থেকেও এই ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়। কেননা, এমতবস্থায় আয়াতটির সম্পর্ক সেই 'ইলম' তথা বিশেষ বিদ্যার সঙ্গে থাকে না, যার কথা পূর্বের আয়াতে বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উপত্যকায় সমবেত মানুষের আত্মরক্ষার জন্য উচ্চারিত বাক্যে এমন কোনো ব্যাপার নেই যা হযরত সুলাইমান আ.-এর হাসার কারণ হতে পারে। তৃতীয়ত, তখন এটি এমন গুরুতর ঘটনা হতো না, যার ওপর হযরত সুলাইমান আ.-এর এতটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্বের প্রকাশ ঘটে, যে বিষয়টি পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। এই কারণগুলো ছাড়াও যদি উল্লিখিত ঘটনাটি কোনো মানবজটলা সম্পর্কিত হতো, তাহলে

প্রশ্ন উঠবে যে, পবিত্র কুরআন কেনো এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট বিষয়টিকে এত জটিল ও ইঙ্গিতপূর্ণ করে ব্যক্ত করলো? কী প্রয়োজনে শব্দের অর্থের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে অহেতুক রহস্য সৃষ্টি করলো? কারণ, যদি কোথাও অসংখ্য মানুষ বা প্রাণীর সমাবেশ ঘটে, তখন তা ব্যক্ত করার জন্য বিভিন্ন ভাষায় এ কথা বলার প্রচলন রয়েছে যে, ওখানে পিপীলিকার মতো গিজগিজ করছে। কিন্তু যেখানে ইতোপূর্বে কোনো মানবগোষ্ঠীর উল্লেখ ঘটে নি, কোনো জাতির সদস্যের কম-বেশির আলোচনা উঠে নি, সেখানে যদি কথার সূচনা এভাবে হয় যে, 'যখন সৈন্যবহর পিপীলিকার উপত্যকা পৌঁছুলো, তখন পিপীলিকা বললো'... তাহলে পৃথিবীর কোনো পরিভাষায় এ কথা বলা যাবে না যে, এখানে নাম্‌ল তথা পিপীলিকা বলতে মানবসদস্যের বড় জটলা উদ্দেশ্য।

আজকের জ্ঞানচর্চার এই যুগে যখন 'প্রাণীর ভাষাজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ'-এর গবেষণা এ কথা স্বীকার করেছে যে, মহান আল্লাহ প্রাণীদেরও উচ্চারণ শক্তি এবং মনোভাব প্রকাশের জন্য বিশেষ ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করেছেন, যদিও তাদের বাকশক্তি মানুষের বাকশক্তির তুলনায় খুবই দুর্বল। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এ কথা উঠে এসেছে যে, প্রাণীদের ভাষার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, প্রাণীদের পৃথক পৃথক বর্ণমালা এখন প্রমাণিত সত্য।[১] বিজ্ঞানচর্চার এমন যুগে যদি 'আল্লাহর ওহি'-এর মাধ্যমে এই অক্ষুণ্ন সত্য প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ এক বান্দাকে (নবীকে) পার্থিব উপকরণের ঊর্ধ্বে নিয়ে প্রাণীদের ভাষা বুঝার ক্ষমতা দান করেছেন, তাহলে ওই সমস্ত লোকদের ওপর ভীষণ তাজ্জব লাগে যে, যাঁরা বিষয়টিকে যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব মনে করেন এবং দুর্বল ব্যাখ্যার এমনকি বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগে একবার বৃষ্টি হচ্ছিলো না। প্রচণ্ড খরার কারণে হযরত সুলাইমান আ. তাঁর জাতির লোকদের সঙ্গে নিয়ে ইসতিসকার নামায আদায়ের উদ্দেশে ময়দানে বের হন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন যে, একটি পিপীলিকা সামনের দু-পা উঠিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে এ দোয়া করছে 'হে আল্লাহ, আমরাও তোমার সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে একটি সৃষ্টি এবং তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী।

[১]. দায়িরাতুল মাআরিফ লিল বুসতানি : ৭/২৮৭-২৮৮

আমাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে ধ্বংস করো না।' তখন হযরত সুলাইমান আ. উপস্থিত লোকদের বললেন, ফিরে চলো। একটি প্রাণীর দোয়া আমাদের সকলের কাজ করে দিয়েছে। এখন তোমাদের চাওয়া ছাড়াই বৃষ্টি হবে।

উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি মারফু ও মাওকুফ দু-ভাবেই ইবনে আসাকির ও ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন।[১] তবে মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে রেওয়ায়েতটিকে সরাসরি নবীজির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা আপত্তিজনক। তবে পিপীলিকা সম্পর্কে সহিহ মুসলিম শরিফে একটি মারফু হাদিসে এসেছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একবার জনৈক নবীকে কোনো একটি পিপীলিকা কামড় দেয়। তখন নবী ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দেশ দেন, ওই পিঁপড়েটি যে গর্ত থেকে বেরিয়ে আমাকে কেটেছে, তা জ্বালিয়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর আল্লাহর ওহি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন, একটি পিপীলিকার কামড়ে তুমি কেনো পুরো ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে? তুমি কি জানো, তাতে অসংখ্য নির্দোষ পিপীলিকা আছে? তুমি কেনো ওই একটি পিপীলিকাকে ধ্বংস করা যথেষ্ট মনে করলে না?[২]

আলোচ্য আয়াতে হযরত সুলাইমান আ.-এর কৃতজ্ঞতার স্বীকারোক্তিমূলক মন্তব্য وَ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (আর আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে)-এর পরিষ্কার ও সহজ অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাকে এমনভাবে ভূষিত করেছেন যে, তিনি আমার ওপর তাঁর নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং গোটা সৃষ্টিজগতের সবকিছু আমার জন্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

সাবার সম্রাজ্ঞীর ঘটনা

পবিত্র কুরআন সুরা নামলে হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার সম্রাজ্ঞীর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে। ঘটনার প্রবাহ ও আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত খুবই হৃদয়গ্রাহী। পরিণতি, শিক্ষা ও উপদেশের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ—

---

১. তারিখে ইবনে কাসির : ২/২, তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৩৫৯

২. মুসলিম শরিফ, কিতাবুল আম্বিয়া

হযরত সুলাইমান আ.-এর সুবিশাল অদ্বিতীয় রাজদরবারে মানবসম্প্রদায় ছাড়াও জিন ও অন্যান্য প্রাণিকুল শাহি সেবা দান করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত থাকতো। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করতো না। একদিনের ঘটনা। হযরত সুলাইমানের শাহি দরবার পূর্ণ রাজকীয় প্রতাপের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হযরত সুলাইমান আ. গোটা দরবার নিরীক্ষণ করার পর লক্ষ্য করলেন, হুদহুদ তার আসনে অনুপস্থিত। বললেন, আমি হুদহুদকে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি না। বাস্তবেই যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে তবে তার এই বিনাকারণ অনুপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। আমি তাকে হয়তো কঠিন দণ্ড দেবো অথবা প্রাণে মেরে ফেলবো। নয়তো তাকে তার এই অনুপস্থিতির যৌক্তিক কারণ বলতে হবে। কিছুক্ষণ পরই হুদহুদ এসে উপস্থিত হলো। হযরত সুলাইমান তাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আমি এমন একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি যা আপনি ইতোপূর্বে পান নি। তা হলো, ইয়ামান অঞ্চলে সাবা রাজ্যে এক সম্রাজ্ঞী রয়েছেন। আল্লাহ তাকে সবকিছু দান করেছেন। তাঁর রাজসিংহাসনটি সৌন্দর্যাবলির অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। সম্রাজ্ঞী ও তার জাতি সূর্যপূজারী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। ফলে তারা বিশ্বনিখিলের প্রতিপালক এক আল্লাহর ইবাদত করে না।

হযরত সুলাইমান বললেন, আচ্ছা, তোমার কথা সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা এখনই হয়ে যাক। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তার কাছে পৌঁছে দাও। আর অপেক্ষা করে শোনো তারা এ ব্যাপারে কী আলোচনা করছে।

হুদহুদ পত্র নিয়ে রানির কোলের ওপর নিক্ষেপ করলো। তিনি পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন, এইমাত্র আমার কাছে একটি সিলমোহরযুক্ত চিঠি এসেছে। তাতে লেখা আছে, 'এই পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে : আমি করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করিছ, আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে (মুসলমান হয়ে) আমার কাছে উপস্থিত হও।'

সম্রাজ্ঞী চিঠি পড়ে শোনানোর পর বললেন, হে আমার পারিষদবর্গ, তোমরা ভালো করেই জানো যে, আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ ছাড়া পদক্ষেপ নিই না। এখন পরামর্শ দাও আমার কী করা উচিত।

পারিষদবর্গ বললেন, ভীত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, আমরা খুবই শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ জাতি। তবে পরামর্শের ক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো, ফয়সালা আপনার হাতে। আপনি যা সঙ্গত মনে করেন, তা-ই আদেশ করুন।

সম্রাজ্ঞী বললেন, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ জাতি। কিন্তু সুলাইমানের ব্যাপারে আমাদের তাড়াহুড়া করা উচিত হবে না। প্রথমে আমাদেরকে তার শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে সম্যক ধারণা পেতে হবে। কেননা, যে বিস্ময়কর পদ্ধতিতে সে আমার কাছে এ চিঠিটি পাঠিয়েছে, তা আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, সুলাইমানের ব্যাপারে ভেবে-চিন্তে কদম ফেলতে হবে। কাজেই আমি চাচ্ছি, প্রথমে আমরা কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। তারা সুলাইমানের জন্য উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে যাবে। আর এই সুযোগে তারা তার শক্তিমত্তা ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে আসবে। এ বিষয়টিও জেনে নেয়া যাবে যে, সে আমাদের থেকে কী চায়? বাস্তবেই যদি সে ভীষণ শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান সম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের লড়তে যাওয়া হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কেননা, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান সম্রাটদের নীতি হলো, তারা কোনো জনপদে বিজয়ীসুলভ প্রতাপ নিয়ে প্রবেশ করলে সেই জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং তার সম্মানিত নাগরিকদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে। তাই বিনা কারণে ধ্বংস ডেকে আনার প্রয়োজন নেই।

সাবার সম্রাজ্ঞীর প্রতিনিধিদল উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলাইমান আ.-এর খেদমতে হাজির হলে তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা ও তোমাদের সম্রাজ্ঞী আমার চিঠির উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছে। তোমরা কি চাচ্ছো যে, এসব উপঢৌকনের মাধ্যমে – যেগুলোকে তোমরা খুবই মূল্যবান মনে করে খুশি বোধ করছো – আমাকে ফুসলাবে? অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, মহান আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন, সেগুলোর মোকাবিলায় তোমাদের এই অতিমূল্যবান উপঢৌকন নিঃসন্দেহে তুচ্ছ। কাজেই তোমরা তোমাদের উপঢৌকন ফেরত নিয়ে যাও। আর তোমাদের রানিকে গিয়ে বলো, যদি তিনি আমার নির্দেশ পালন না করেন তাহলে আমি এমন এক বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে সাবার এলাকায় পৌঁছবো যাদের মোকাবিলা করতে তোমরা অক্ষম। আর এরপর আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করে শহর থেকে বিতাড়িত করবো।

প্রতিনিধিদল ফিরে এসে সম্রাজ্ঞীর কাছে গোটা বৃত্তান্ত উল্লেখ করলো। তারা হযরত সুলাইমানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির যে দৃশ্য দেখেছে অক্ষরে অক্ষরে

তার বিবরণ তুলে ধরলো এবং বললো, তাঁর শাসনকর্তৃত্ব শুধু মানবজাতির ওপর নয়, বিশাল দেহের জিনজাতি ও প্রাণিকুলও তাঁর কর্তৃত্বের অনুগত। সাবার সম্রাজ্ঞীর তাদের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, যে, হযরত সুলাইমানের সঙ্গে লড়াই করার অর্থ হলো, নিজের ধ্বংস ডেকে আনা। কাজেই তার আহ্বানে সাড়া দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

হযরত সুলাইমান আ. তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ। সাবার সম্রাজ্ঞী যেহেতু হযরত সুলাইমানের ধর্ম ও রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতেন না, এ কারণে তিনি ওই চিঠির মুসলিম শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরে নিয়ে মনে করেছিলেন, প্রতাপশালী বাদশাহদের মতো সুলাইমানেরও ইচ্ছে হলো, আমি যেনো তার শাসনকর্তৃত্ব ও রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে অধীনতা মেনে নিই। সাবার সম্রাজ্ঞীর তা মেনে নিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন এবং সুলাইমানের খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

হযরত সুলাইমান আ. ওহির মাধ্যমে জেনে ফেললেন যে, সাবার সম্রাজ্ঞীর খেদমতে হাজির হচ্ছেন। তখন তিনি তাঁর পারিষদবর্গকে ডেকে বললেন, আমি চাচ্ছি, সম্রাজ্ঞী সাবা এখানে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাঁর সিংহাসন উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসা হোক। তোমাদের মধ্যে কে আছো যে এ কাজ করতে সক্ষম। এ কথা শুনে এক বিশাল দৈত্যাকৃতির জিন বললো, আপনার আজকের দরবার শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি তা এখানে এনে হাজির করতে পারবো। আমি সেই শক্তি রাখি। দ্বিতীয়ত, আমি সেই মূল্যবান বস্তুর আমানতের হিফাযত করতে সক্ষম। কখনো এতে খিয়ানত করবো না।

দৈত্যাকৃতির জিনের কথা শেষ হলে হযরত সুলাইমান আ.-এর এক মন্ত্রী বললেন, আমি চোখের পলকেই সেই সিংহাসন আপনার খেদমতে হাজির করতে সক্ষম। হযরত সুলাইমান আ. তার দিকে চেহারা ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন যে, সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন হাজির। তখন বললেন, এটি আমার প্রতিপালকের দয়া ও অনুগ্রহ। এর মাধ্যমে তিনি আমার পরীক্ষা গ্রহণ করেন যে, আমি এতে শুকরিয়া আদায় করি না-কি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিই। আর বাস্তবতা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেরই উপকার করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করে, আল্লাহ তার অবাধ্যতার কোনো পরোয়া করেন না। তিনি এর থেকে অনেক উর্ধ্বে। অবাধ্য ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের পর হযরত সুলাইমান আ. হুকুম করলেন, তার রাজসিংহাসনের অবয়বে পরিবর্তন আনো। আমি দেখতে চাই, সিংহাসনটি দেখার পর সম্রাজ্ঞী তা চিনতে সক্ষম হন না-কি ব্যর্থ হন।

কিছুক্ষণ পর সাবার সম্রাজ্ঞীর হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। দরবারে হাজির হতেই হযরত সুলাইমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সিংহাসনটি কি এমনই? বুদ্ধিমতী সাবা উত্তর দিলেন, 'মনে হচ্ছে, এটি সেটিই'। অর্থাৎ সিংহাসনটির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হচ্ছে, এটি আমারই সিংহাসন। তবে আকৃতির পরিবর্তন সেই দৃঢ়তায় সংশয় সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারছি না যে, এটি আমারই সিংহাসন।

সাবার সম্রাজ্ঞীর এ কথাও বললেন, আপনার অদ্বিতীয় রাজশক্তি ও দোর্দণ্ড ক্ষমতার কথা আমি পূর্ব থেকেই জানি। এ কারণে আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করে খেদমতে হাজির হয়েছি। সিংহাসনের এই বিস্ময়কর ঘটনা আমার সামনে আপনার দোর্দণ্ড প্রতাপের জীবন্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। যা আমার আনুগত্য ও বশ্যতাকে আরো পোক্ত করেছে। এ কারণে আমি আরেকবার আপনার খেদমতে আপনার প্রতি আমার আনুগত্য ও বিশ্বস্তা স্বীকার করছি।

সম্রাজ্ঞী বিশ্বাস করেছিলেন যে, وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ (আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি) বলার মাধ্যমে আমি সুলাইমানের নির্দেশ পালন করেছি, তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করেছি। অথচ তা নয়, বরং সাবার সম্রাজ্ঞীর এতদিনের শিরকাশ্রিত জীবনের চোখ থেকে পর্দা না সরায়, তিনি হযরত সুলাইমানের বার্তার সত্য বুঝতে পারেন নি। সূর্যপূজার পর্দার কারণে তিনি হেদায়েতের মর্ম অনুধাবন করতে পারেন নি। এ কারণে হযরত সুলাইমান আ. তাঁর উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য দ্বিতীয় সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করতে চাইলেন। এ পথেও তিনি তাঁর প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের স্বাক্ষর রাখলেন। এভাবে যে, তিনি প্রথমে জিনজাতির সহায়তায় একটি আলিশান শীষমহল তৈরি করলেন। উজ্জ্বল ঝকঝকে কাঁচের চাকচিক্য, প্রাসাদের বিশালতা ও বিস্ময়কর নির্মাণশিল্পের প্রয়োগের ফলে আলীশান শীষমহলটি ছিলো অতুলনীয় সৌন্দর্যের আধার। শীষমহলের সামনে ছিলো বিশাল বড় একটি আঙ্গিনা। হযরত সুলাইমান আ. সেখানে একটি বিশাল হাউয তৈরি করে জল দিয়ে ভরলেন। তার ওপর অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ কাঁচের টুকরো দিয়ে এমন চমৎকার মেঝে নির্মাণ করলেন

যে, যে কোনো পর্যটকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতো। মনে করতো, এই আঙ্গিনায় পরিষ্কার পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

সাবার সম্রাজ্ঞীকে বলা হলো, আপনি এই রাজপ্রাসাদে আরাম করুন। সম্রাজ্ঞী যখন রাজপ্রাসাদের সামনে পৌঁছুলেন, তখন তিনি মনে করলেন, এখানে তো পরিষ্কার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাই তিনি পানিতে অবতরণের জন্য পায়ের গোড়ালি থেকে কাপড় উপরের দিকে টেনে তুললেন। তখন হযরত সুলাইমান আ. বললেন, এর কোনো প্রয়োজন নেই। এটি পানি নয়। গোটা রাজপ্রাসাদ ও তার সামনের এই ঝকঝকে আঙ্গিনাটি আদ্যোপান্ত কাঁচের তৈরি।

ঘটনাটি সম্রাজ্ঞীর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর গভীর প্রভাব ফেললো। এবার তাঁর চিন্তাশক্তি জাগ্রত হলো যে, আমাকে এখন অবশ্যই বাস্তবতার গভীরে যেতে হবে। তিনি তখন বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এতক্ষণ ধরে যা কিছু হচ্ছে এটি প্রতাপশালী মহাসম্রাটের শক্তির প্রদর্শনী নয়, বরং তিনি এগুলোর মাধ্যমে আমাকে বুঝাতে চাইছেন যে, সুলাইমানের এই অদ্বিতীয় রাজশক্তি ও মুজেযাসুলভ শক্তিমত্তা এমন কোনো সত্তার দান, যিনি শুধু জমিনের-ই মালিক নন, বরং চন্দ্র-সূর্যের ওপরও তার প্রভুত্ব। কাজেই এ সব ঘটনার মাধ্যমে সুলাইমান আমাকে শুধু তাঁর নিজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের দিকে আহ্বান করছেন না, বরং সেই 'একক সত্তা'-এর অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করতে আহ্বান করছেন। এটাই তাঁর উদ্দেশ্য।

সম্রাজ্ঞীর মনে এই ভাবনা উদিত হতেই তিনি হযরত সুলাইমান আ.-এর সামনে দাঁড়িয়ে একজন অনুতপ্ত ও অনুশোচনা পীড়িত মানুষের মতো মহান আল্লাহর উদ্দেশে হাত তুলে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আজ পর্যন্ত আমি গায়রুল্লাহর উপাসনা করার মাধ্যমে আমার নিজের ওপর বড় জুলুম করেছি। কিন্তু এখন আমি সুলাইমানের সঙ্গী হয়ে একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনছি। যিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' এভাবে ইয়ামানের সাবার সম্রাজ্ঞীর হযরত সুলাইমান আ.-এর বার্তা وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (মুসলমান হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও)-এর উদ্দেশ্য উপলব্ধি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

কুরআনুর কারিম সাবার সম্রাজ্ঞীর ঘটনা অলৌকিক সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে যে, ঘটনা বর্ণনা করার পেছনে মূল লক্ষ্য যে 'নসিহত প্রদান করা', সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘটনারগুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু এটাও জানা গেছে যে, এর আগের আয়াতসমূহে হযরত সুলাইমান আ.-কে পাখির ভাষা বোঝার যে ক্ষমতা দান করার কথা বলা

হয়েছিলো তা প্রমাণের জন্য এটি দ্বিতীয় ঘটনা যা হুদহুদের সঙ্গে হযরত সুলাইমান আ.-এর আলাপচারিতার দ্বারা শুরু হয়েছে—

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ () لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ () فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ () إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ () وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ () أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ () اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ () قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ () اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ () قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ () إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ () أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ () قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ () قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ () قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ () وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ () فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ () ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ () قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ () قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ () قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ () قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ () فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ () وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ () قِيلَ لَهَا

ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

'সুলাইমান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছি না কেন? না-কি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেবো কিংবা হত্যা করবো অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বললো, 'আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা' থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার নিকট একটি বিরাট সিংহাসন রয়েছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলি সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের মালিক। সুলাইমান বললো, 'এখন আমি দেখবো তুমি সত্য বলছো, না তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড়ো এবং দেখো, তারা কী জওয়াব দেয়? বিলকিস বললো, হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' বিলকিস বললো, হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাছে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বললো, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। সে বললো, রাজা-বাদশাহরা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি, প্রেরিত লোকেরা কী জওয়াব আনে। অতঃপর যখন দূত সুলাইমানের কাছে আগমন করলো, তখন সুলাইমান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা

আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিস্কৃত করবো এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। সুলাইমান বললেন, হে পারিষদবর্গ, 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক দৈত্য-জিন বললো, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিলো, সে বললো, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো। অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। সুলাইমান বললেন, বিলকিসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলে দাও, দেখবো সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? অতঃপর যখন বিলকিস এসে গেলো, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বললো, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার উপাসনা করতো, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিলো। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাকে বলা হলো, এ প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো সে ধারণা করলো যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেললো। সুলাইমান বললো, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকিস বললো, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।' [সুরা আন-নামল : ২০-৪৪]

কয়েকটি বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়

হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার সম্রাজ্ঞীর উল্লিখিত ঘটনার কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণযোগ্য। বিষয়গুলোর সমাধান হওয়াও জরুরি। নিম্নে আমরা ধারাবাহিকতার সঙ্গে বিষয়গুলো উপস্থাপন করছি—

সাবা কোথায় অবস্থিত?

সাবার সম্রাজ্ঞীর সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ 'সাইলুল আরিম'-এর আলোচনায় আসবে। এখানে শুধু এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, সাবা হলো কাহতানি বংশধারার একটি প্রসিদ্ধ শাখা। তিনি ছিলেন এই গোত্রের উর্ধ্বপুরুষ। তার নাম ছিলো উমর বা আবদে শামস। সাবা হচ্ছে উপাধি। আরব গবেষক ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের এটাই অভিমত। তবে তাওরাতের বক্তব্য হলো, সাবা ছিলো তার নাম। তিনি ছিলেন খুবই সাহসী ও বীরপুরুষ। চতুর্দিকে তিনি তার বিজয়ঝাণ্ডা উড্ডীনের মাধ্যমে সাবা সম্রাজ্য গড়ে তোলেন। সাবার উত্থানের সময়কাল গবেষকদের মতে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সাল বলা হয়ে থাকে। কারণ, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালে তার শাসনক্ষমতা ও শক্তিমত্তার উত্থানের কথা দাউদ আ.-এর যাবুরে পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

সাবার সম্রাজ্ঞীর নাম

পবিত্র কুরআন হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার সম্রাজ্ঞীর ঘটনা আলোচনাকালে সম্রাজ্ঞীর নাম উল্লেখ করে নি। এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে নি যে, তিনি সাবার শাসনসীমার তিনটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল ইয়ামান, হাবশা ও উত্তর আরবের মধ্য হতে কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন। কেননা, কুরআনের মূল উদ্দেশ্যের জন্য এ বিষয়গুলো নিষ্প্রয়োজন। তবে আরব ইহুদিদের ইসরাইলি ইতিহাসে তার নাম বলা হয়েছে, বিলকিস। আহলে হাবশা – যারা দাবি করে থাকে যে, তারা সাবার সম্রাজ্ঞীর ও হযরত সুলাইমানের বংশধর – তারা নিজেদের ভাষায় সম্রাজ্ঞীর নাম 'মাকিদাহ' বলে থাকে।

তারগুমে[৩] এসেছে, তার রাজত্ব ছিলো ফিলিস্তিনের পূর্বদিকে। আর ইঞ্জিলে[৪] এসেছে, ফিলিস্তিনের দক্ষিণে। ইউসিফূস[৫]-এর ইতিহাসে রয়েছে যে, তিনি ছিলেন মিসর ও হাবশার সম্রাজ্ঞী। হাবশার অধিবাসীরা তাকে হাবশি বংশোদ্ভূত বলে দাবি করে থাকে। হাবশার রাজারা এখনো গর্ব করে বলে থাকে যে, তারা সাবা রানির সন্তান।

---

[৩]. জিউস ইনসাইক্লোপিডিয়া, 'সাবা'

[৪]. মাত্তা, অধ্যায় : ১২, আয়াত : ৪২। লুকা, অধ্যায় : ১১, আয়াত : ৩১

[৫]. আরদুল কুরআন। ইউসুফিসের ইতিহাস হতে সংগৃহীত। খণ্ড : ১। সুলাইমান আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত আলোচনা।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের মধ্য হতে গবেষকগণ ইউসিফুসের বর্ণনাকে ভুল অভিহিত করেছেন আর বাকি দুটি বর্ণনার সারমর্ম অভিন্ন বলেছেন। কারণ হলো, এই দুটি অঞ্চল ইয়ামানেরই অধিভুক্ত এলাকা। তারা ইঞ্জিলের ভাষ্যকে অধিক শুদ্ধ মনে করে থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, মূল ইয়ামান অঞ্চলের শিলালিপি ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ব থেকে কোনো মহিলার শাসক হওয়া প্রমাণিত হয় না। তবে উত্তর আরবের ইরাক সংলগ্ন এলাকায় চারজন প্রাচীন মহিলা শাসকের নাম অবশ্য পাওয়া যায়। কাজেই এ সম্ভাবনাই বেশি যে, সাবার সম্রাজ্ঞীর এই অঞ্চল থেকেই হযরত সুলাইমান আ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হুদহুদ

পবিত্র কুরআন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর পত্রবাহ হুদহুদ ছিলো একটি পাখি। কিন্তু প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারলিজমের দোহাই দিয়ে বর্তমান সময়ের কতিপয় বুদ্ধিজীবী এ ধরনের মুজেযাধর্মী ঘটনার সামনে এসে কপাল কুঁচকে ফেলে। এগুলোকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে কুরআনের আয়াত পর্যন্ত অস্বীকার করতে উদ্যত হয়। আর যদি ধর্মের ওপর তাদের করুণা জাগে তাহলে এ জাতীয় আয়াতগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করে না, তবে অর্থের ক্ষেত্রে বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সময় তারা কুরআনের উদ্দেশ্যের বিপরীতে গিয়ে মনগড়া অপব্যাখ্যা পেশ করে। এখানেও তাই ঘটেছে। প্রথমত, তারা পাখির সঙ্গে কথাবার্তা বলাকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করেছে। এরপর আলোচিত ঘটনা সম্বলিত আয়াতের অর্থ এভাবে দিয়েছে যে, প্রাচীন যুগে মুশরিকদের সমাজে পূজনীয় দেব-দেবীর নামে নিজ সন্তানদের নাম রাখার প্রচলন ছিলো। যেখানে প্রাণীদের নামও থাকতো। সেই ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত আয়াতে হুদহুদ বলতে কোনো পাখি উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে হযরত সুলাইমান আ.-এর পত্রবাহক জনৈক মানুষ উদ্দেশ্য। যার নাম ছিলো সম্ভবত হুদহুদ। কিন্তু যখন তাকে এ প্রশ্ন করা হয় যে, পবিত্র কুরআন পরিষ্কার শব্দে এ কথা বলেছে, وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ (সুলাইমান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন) তাহলে হুদহুদকে মানুষ বলা কিভাবে সঠিক হয়? মৌলবি চেরাগ আলি তার এই উত্তর দিয়েছেন যে, এভাবে الطير শব্দের অর্থ হলো, 'সৈন্য'। অর্থাৎ যখন হযরত সুলাইমান সৈন্যবাহিনীর খোঁজ-খবর নিলেন। হায় আফসোস, তার বলা এই অর্থের কোনো সনদ নেই। আরবি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী এটি প্রত্যাখ্যাত। আর এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, ভাষার

ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। বরং মূল ভাষাভাষীদের ব্যবহারের অনুগমন করতে হয়। আহলে আরবগণ হাকিকি ও মাজাযি কোনোভাবেই طير শব্দকে সৈন্য অর্থে ব্যবহার করেন না। বরং الطير ও طير শব্দটি যখন কোনো اضافت বা متعلقات এর সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটি একমাত্র 'পাখি' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে একটি জীবন্ত ভাষায়। আরবি ভাষা। যার ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে, لسان عربي مبين (এটি স্পষ্টকারী আরবি ভাষা)। এটি কোনো মৃত ভাষা নয় যে, যে কেউ এসে তার ইচ্ছেমাফিক অর্থ করবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এসে 'আসহাবে ফিল বা হস্তিবাহিনী'-এর ঘটনা অস্বীকার করে আর বলে طيرا ابابيل-এ طير শব্দের অর্থ হলো, কুলক্ষণ। আরেক ব্যক্তি এসে যদি সুলাইমানের হুদহুদ-এর পাখি হওয়াকে অস্বীকার করে আর বলে, وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ-এ طير শব্দের অর্থ হলো, সৈন্য। আর তাদের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা আপন আপন স্থানে আরবি ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, আরবি পরিভাষা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভুল হয়, তাহলে আমরা কেনো তাদের অপব্যাখ্যাকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবো না?

ভীষণ আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি এখানে মৌলবি চেরাগ আলির অপব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বিষয়টির একটি যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দেয়ার অভিপ্রায়ে বলেছেন-

'যদি পাখিদের কথা বলার বিষয়টি তোমাকে দ্বিধান্বিত করে, তাহলে ধরে নাও, পত্রবাহী কবুতরের মতো সেই যুগে পত্রবাহী হুদহুদও প্রশিক্ষিত হতো। বাকি থাকলো, তার কথা বলার বিষয়টি, বুঝে নাও, সে বিষয়বস্তু-সম্বলিত পত্র বহন করতো। যেমন, এখানেই কুরআন মাজিদে এসেছে যে, হযরত সুলাইমান আ. হুদহুদের মারফত সাবার রানির কাছে পত্র পাঠিয়েছিলেন। এভাবে সে হয়তো পূর্বেও পত্র বহন করেছিলো।'[১]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন পবিত্র কুরআন منطق الطير (পাখির সঙ্গে আলাপচারিতার জ্ঞান), نملة (পিপীলিকা) ও هدهد (হুদহুদ পাখি)-এর ঘটনা ইত্যাদিকে হযরত সুলাইমান আ.-এর ওপর আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ ও সীমাহীন অনুকম্পা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং পবিত্র কুরআন এসব ঘটনার পূর্বাপরের মাধ্যমে এমন ভাবে উপস্থাপন করেছে যে, যার দ্বারা হুদহুদের পাখি হয়ে হযরত সুলাইমান আ.-এর সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ

---

[১]. আরদুল কুরআন : ১/২৬৮

পরিষ্কার প্রমাণিত হয়, তখন কতিপয় প্রকৃতিবাদী বুদ্ধিজীবীর প্রমাণহীন অস্বীকারের ডামাঢোলে প্রভাবিত হয়ে এবং ওই শ্রেণির লোকদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নিজেদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে পর্দাবৃত করার অপচেষ্টাকে মেনে নিয়ে সাইয়িদ সুলাইমান সাহেব কেনো এমন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন, যা পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপন্থী? উপরন্তু কোনো ঘটনা যদি তাওরাত বা ইসরাইলি রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে ওই ঘটনার পাওয়া যাওয়াটা তার ভুল বা বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। বরং যদি পবিত্র কুরআন বা বিশুদ্ধ হাদিস দলিল সহকারে সেটিকে বানোয়াট প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআন ও হাদিসের আলোকিত মূলনীতি ও স্বীকৃত ঘোষণার বিপরীতে তাওরাত বা ইসরাইলি রেওয়ায়েত কোনো ঘটনা বর্ণনা করে অথবা এমন কোনো বিবরণ নকল করে যা কুরআন-হাদিসে নেই এবং যুক্তি ও প্রজ্ঞার নিরিখে সেটিকে অবান্তর ও বানোয়াট মনে হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এ জাতীয় সমস্ত ইসরাইলি রেওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু একটি ঘটনা পবিত্র কুরআন বা হাদিসে রাসুলে স্পষ্ট বিদ্যমান থাকে আর তাওরাত বা ইসরাইলি সাহিত্যও অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করেছে, তাহলে ঘটনাটি ইসরাইলি সাহিত্যে বিদ্যমান থাকার অজুহাতে বিভ্রান্তিকর অভিহিত করে পবিত্র কুরআনের পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বিকৃতি ও দুর্বল ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া কোনোভাবে জায়েয হতে পারে না। বরং এক্ষেত্রে ইসরাইলি সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনাকে কুরআন ও হাদিসে বিবৃত ঘটনার সমর্থনে পেশ করার পূর্ণ অনুমতি রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদহুদ (পাখিটি) ছিলো হযরত সুলাইমান আ.-এর পক্ষ থেকে পানি খোঁজার গোয়েন্দা। কোথাও যদি মাটির নিচে পানি থাকতো আর সৈন্যবাহিনীর পানির প্রয়োজন পড়তো, তখন হুদহুদ এসে জানিয়ে দিতো যে, এখানে এতটুকু গভীরে পানি রয়েছে। তখন হযরত সুলাইমান জিনদেরকে দিয়ে সেখানে খনন করে পানি উত্তোলন করাতেন।[১]

সাবার সম্রাজ্ঞীর রাজসিংহাসন

আমরা হুদহুদ পাখির বয়ানে সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনের বিবরণ জেনেছি। এবং এক্ষেত্রে হযরত সুলাইমান আ.-এর মুজেযার কথাও কুরআনে বর্ণিত

---

[১]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/২১

রয়েছে যে, তাঁর নির্দেশে চোখের পলকে সিংহাসনটি সাবার দেশ থেকে হযরত সুলাইমানের দরবারে নিয়ে আসা হয়। সিংহাসনটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি বক্তব্য সামনে রাখতে হবে।

১। সাবার সম্রাজ্ঞীর তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যে উপঢৌকন পাঠিয়ে ছিলো, হযরত সুলাইমান তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন—

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ () ارْجِعْ إِلَيْهِمْ

'তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ফিরে যাও তাদের কাছে।' [সূরা নামল]

২। যখন হযরত সুলাইমান আ. জানতে পারেন যে, সাবার সম্রাজ্ঞীর (তাঁর কাছে আসতে) রওয়ানা হয়েছে তখন তিনি তার পারিষদবর্গকে বলেছিলেন—

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

'হে পারিষদবর্গ, 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?'

৩। তখন সর্বপ্রথম এক দৈত্য-জিন বলেছিলেন, আমি আপনার আজকের দরবার শেষ হওয়ার পূর্বেই তা এখানে এনে হাজির করতে পারবো। আমি আমার দাবি প্রমাণিত করতে সক্ষম। কারণ আমি ভীষণ শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, আমি মূল্যবান বস্তুর আমানতের হিফাযত করতে সক্ষম। কখনো এতে খিয়ানত করবো না। ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

'জনৈক দৈত্য-জিন বললো, 'আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।'

৪। হযরত সুলাইমান আ.-এর জনৈক মন্ত্রী তখন বলেন, আমি আপনার চোখের পলক পড়তেই তা আপনার সম্মুখে এনে হাজির করতে পারবো। ইরশাদ হয়েছে—

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

'আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো।'

৫। সুলাইমান আ. চোখের পলক ফেলতেই দেখতে পেলেন, সিংহাসনটি হাজির। এ দৃশ্য দেখতেই তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মহান আল্লাহর এত বিশাল অনুগ্রহ প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য এ পরীক্ষা যে, আমি কি তার শোকরগুজার বান্দা হচ্ছি না-কি অকৃতজ্ঞ হচ্ছি। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

'অতঃপর সুলাইমান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।'

৬। হযরত সুলাইমান আ. তখন নির্দেশ দিলেন, এই রাজসিংহাসনের অবয়বে পরিবর্তন করো। ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

'সুলাইমান বললেন, বিলকিসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলে দাও, দেখবো সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই?'

সাবার সম্রাজ্ঞীর তার সফর শেষে হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? তিনি বুদ্ধিদীপ্ত জবাব দিয়ে বলেছিলেন, মনে হয়, এটা সেটাই। ইরশাদ হয়েছে—

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ

'অতঃপর সে এলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বললো, মনে হয় এটা সেটাই।'

সিংহাসন সম্পর্কে এই বিবরণ এবং আলোচনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার বুঝে আসবে যে, এখানে কুরআন এমন একটি সিংহাসনের কথা বলেছে, রানির প্রতি পয়গাম প্রেরণের আগেই হুদহুদ তার সংবাদ দিয়েছিলো। এটি সুলাইমান আ.-এর জন্য নির্মিত ছিলো না। কারণ হলো, প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে যে অমূল্য উপঢৌকনসমূহ প্রেরণ করা হয়েছিলো, তার তালিকায় সিংহাসনের নাম নেই। আর সেই উপঢৌকনসমূহ ফেরত পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর আসার সংবাদ শোনার পর হযরত সুলাইমান আ. তাঁর রাজদরবারে উপনীত হওয়ার পূর্বেই সিংহাসনটি এখানে উপস্থিত করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন। আর সেটিকে হাজির করার সময়

এমন বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটেছিলো যে, জিনজাতির মধ্য হতে দৈত্যাকৃতির বিশাল একটি জিন এ অঙ্গীকার করেছিলো যে, আপনার আজকের এই রাজদরবার ভাঙার পূর্বেই আমি তা উঠিয়ে আনতে সক্ষম। কিন্তু হযরত সুলাইমানের জনৈক আস্থাভাজন ব্যক্তি বললেন, আমি চোখের পলকেই সেটিকে হাজির করছি। এবং সে সেটিকে তৎক্ষণাৎ হাজির করতে সক্ষমও হয়। হযরত সুলাইমান আ. তখন মহান আল্লাহর এই বিশাল বিস্ময়কর ক্ষমতা অবলোকন করে প্রথমে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটিকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে স্বীকার করেন এবং এরপর তিনি সিংহাসনের কাঠামোয় পরিবর্তন করার নির্দেশ প্রদান করেন। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পর যখন সাবার সম্রাজ্ঞীর হযরত সুলাইমান আ.-এর রাজদরবারে উপস্থিত হন এবং সিংহাসন সম্পর্কে তাদের পরস্পরে প্রশ্নোত্তর হয়, ঘটনার এ পর্যায়েও কিন্তু পবিত্র কুরআন সাবার সম্রাজ্ঞীর কোনো উপঢৌকনের কথা উল্লেখ করে নি।

উল্লিখিত বিবরণের কোথাও আমি আমার পক্ষ থেকে কোনো রূপ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিই নি। কোথাও আলোচনাকে আমার ইচ্ছের মোতাবেক করার অভিপ্রায়ে ভাঙতে বা গড়তে যাই নি। কাজেই সিংহাসন কেন্দ্রিক ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অনেক বড় মুজেযা এবং এটি হযরত সুলাইমান আ.-এর নবুয়ত ও রিসালাতের অনেক বড় নিদর্শন। এর বাইরে যদি কেউ অন্যকোনো অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে বাতিল। কারণ হলো, সেটিকে তখন পবিত্র কুরআনের পরিষ্কার ও সরল অংশগুলো এড়িয়ে দাঁড় করাতে হবে, যেমনটি মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদবি সাহেব করেছেন অথবা সেটির কয়েকটি শব্দ থেকে ভুল ফায়েদা লুটে গোটা ঘটনার মর্মকে বিকৃত করা হবে।

আল্লামা নদবি সাহেব উল্লিখিত আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অধ্যয়ন করার পর যে কোনো চক্ষুস্মান ব্যক্তি এই ইনসাফ করতে সমর্থ হবেন যে, পবিত্র কুরআনের আলোচিত ঘটনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার সেই ব্যাখ্যার কতটুকু সম্পর্ক রয়েছে? তিনি লিখেছেন—

'আমার মত এই যে, সাবা সম্রাজ্ঞী উপঢৌকন হিসেবে হযরত সুলাইমান আ.-এর জন্য তাঁর দেশের কারুশিল্পের একটি নিদর্শন তৈরি করিয়েছিলেন। যেহেতু এটি উপঢৌকন ছিলো, তাই অবশ্যই সম্রাজ্ঞী তার সঙ্গে করে জিনিসটি নিয়ে এসেছিলেন। এটি উপঢৌকন হওয়ার প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআন সাবার প্রথম প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপঢৌকন থাকার কথা উল্লেখ করেছে। আর 'নাবূইমে'ও সাবার উপঢৌকনের উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনে রয়েছে, হযরত সুলাইমানের জনৈক পারিষদ – যিনি কিতাবের জ্ঞান রাখতেন – নিবেদন করলেন, আমি চোখের পলকেই সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন উঠিয়ে আনছি। এখানে চোখের পলকে সিংহাসন উঠিয়ে আনার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, –যেমনটি আমরা আমাদের ভাষাতেও বলে থাকি– দ্রুততার সঙ্গে উপস্থিত করা। তদ্রূপ আরবি ভাষার এই বাক্য قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ দ্বারাও এই উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া উচিত। কতিপয় তাবেঈন ও মুফাসসিরও ওই শব্দের এ অর্থই নিয়েছেন। যদি কেউ এ কথা বলে যে, বাস্তবেই ওই ব্যক্তি চোখের পলকে পূর্ণ কাজটি করে ফেলেছিলো, তাহলে প্রকৃত বিচারে তার সে কথা হবে ভাষার প্রবাদ বচন সম্পর্কে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।'

কতই না ভালো হতো, যদি সাইয়িদ সাহেব সেই তাবেঈন ও মুফাসসিরদের নামও জানাতেন, যাঁরা সাইয়িদ সাহেবের ব্যাখ্যার অনুরূপ অর্থ করেছেন। অবশ্য তো এই বাক্য قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ দ্বারা দ্রুততার সঙ্গে কোনো কাজ সম্পাদন করার অর্থ গ্রহণ করাকে তো কেউ অস্বীকার করে নি। তবে পার্থক্য হলো, সাইয়িদ সাহেব এই দ্রুততাকে প্রবাদ বচনের গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ রাখতে চান। আর পবিত্র কুরআন এই স্থানে সেটিকে ওই সীমারেখার উর্ধ্বে তুলে হযরত সুলাইমানের একটি 'মুজেযাসুলভ নিদর্শন' হিসেবে প্রকাশ করতে চাচ্ছে। এ কারণেই একে দৈত্যাকার জিনের উক্তি قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ (আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে)-এর ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে । নয়তো দুটি জিনিস অর্থহীন হয়ে যাবে :

১. যখন হযরত সুলাইমান আ. চাচ্ছিলেন যে, সাবা সম্রাজ্ঞীর রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই এটি তার তোষাখানা থেকে এখানে চলে আসুক, তখন তো তাঁর ইচ্ছে পূরণের জন্য قوي أمين তথা দৈত্যাকৃতির জিনের প্রস্তাবই যথেষ্ট ছিলো। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রস্তাবের কী প্রয়োজন ছিলো?

২. যদি কিতাবের জ্ঞানধারী দ্বিতীয় ব্যক্তির ওই কথাটি নিরেট প্রবাদবচনই হয়ে থাকে তবে তা উল্লেখ করার কী প্রয়োজন? এবং পবিত্র কুরআনও বা কেনো সেটিকে এত তাৎপর্য সহকারে উল্লেখ করলো?

নাজ্জার এ প্রসঙ্গে চমৎকার কথা লিখেছেন—

হযরত সুলাইমান আ. সাবা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন কিতাবের জ্ঞানধারী ব্যক্তির সহায়তায় যে বিশেষ পদ্ধতিতে উঠিয়ে এনেছেন, সেটিকে বর্তমান জ্ঞান-

বিজ্ঞান উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম নয়। আর সিংহাসনের ঘটনাটি যেহেতু পরিষ্কার নস-এর মাধ্যমে প্রমাণিত; কাজেই তার প্রামাণিকতা যেমন অকাট্য, তেমনি তার ভাষ্যও অকাট্য। পক্ষান্তরে যারা এ ব্যাখ্যা করেছেন, এখানে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই ব্যক্তির কাছে সুলাইমানি সাম্রাজ্যের মানচিত্র থাকতো। কাজেই তার জানা ছিলো, এই সিংহাসনটি হযরত সুলাইমানের কোনো রাজভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিলো। এ ধরনের ব্যাখ্যাকারকদের অপব্যাখ্যা নেহায়েতই ঠুনকো। যার ওপর আমাদের আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কেননা, যখন স্বাভাবিকতার বিপরীতে কোনো মুজেযা ঘটার প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তখন তা অস্বীকার করে ও বিনা দলিলে প্রত্যাখ্যান করে কী লাভ! কেননা, যিনি প্রকৃতির বিধান সৃষ্টি করেছেন, তিনি প্রকৃতির কোনো স্বাভাবিক রীতিকে ঘুরিয়ে দেয়ারও শক্তি রাখেন। আমরা এ কথা কেনো স্বীকার করতে পারছি না যে, আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় মুজেযাসুলভ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার জন্য প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে উঠে 'প্রকৃতির বিশেষ জরুরি আইন' প্রয়োগ করে থাকেন। 'মানবজ্ঞান' আজ পর্যন্ত 'প্রকৃতির সেই বিশেষ জরুরি আইন' উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয় নি। এই বিশেষ জরুরি আইন সম্পর্কে একমাত্র তিনি-ই অবগত, যার হাত দিয়ে সেই মুজেযার প্রকাশ ঘটে। বাস্তবতা হলো, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ [আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর এই স্বাধীনতা রয়েছে।][1]

عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (আসমানি কিতাবের ইলমধারী) কে ছিলেন?

মুফাসসিরগণ বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলেছে যে, তাঁর কাছে কিতাবের 'ইলম' ছিলো, তার নাম হলো, আসিফ[2] ইবনে বারখিয়া। তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমানের একান্ত আস্থাভাজনদের একজন। শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীদের অন্যতম ছিলেন তিনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে এটাই বর্ণিত। কতিপয় মুফাসসির অন্য নামও বলেছেন।[3] তবে অধিকাংশ তাফসিরবেত্তার দৃষ্টিতে প্রথম অভিমতটিই অগ্রগণ্য।

---

[1]. কাসাসুল আম্বিয়া : ৩৯৬

[2]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৩৬৪ ও তারিখে ইবনে কাসির : ২/২৩

[3]. প্রাগুক্ত

মুফাসসিরগণ এ আলোচনাও তুলেছেন যে, ওই লোকটি কি মানুষ ছিলো না-কি জিনজাতির সদস্য ছিলো। হযরত যাহহাক, কাতাদাহ ও মুজাহিদ রহ.-এর মতে, তিনি ছিলেন একজন মানুষ।[১]

ওই লোকটি সম্পর্কে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, আয়াতের এই অংশ عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ এ 'ইলমুল কিতাব' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লোকটি 'ইসমে আযম' জানতো। এর বিপরীতে কয়েকজন আধুনিক লেখকের বক্তব্য হলো, এর দ্বারা হযরত সুলাইমান আ.-এর সরকারি নিবন্ধক ও রাষ্ট্রীয় নথি-পত্র উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লোকটি উপঢৌকনের নথি-পত্রের দায়িত্বশীল হওয়ার কারণে তার জানা ছিলো, সেই 'সিংহাসন' রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোন অংশে সংরক্ষিত রয়েছে। আর সাইয়িদ সুলাইমান সাহেব বলেন—

'আরবি পরিভাষায় 'কিতাব' শব্দটি প্রায় সময় 'চিঠি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। খোদ এখানেই পবিত্র কুরআন দুটি স্থানে) এই অর্থেও ব্যবহারও করেছে। কাজেই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পারিষদদের মধ্য হতে যিনি সাবার সম্রাজ্ঞীর চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তিনি জানতেন যে, সে উপঢৌকন হিসেবে নিজের সঙ্গে একটি সিংহাসন এনেছে। সেহেতু সেই পারিষদ লোকটি বললেন, 'আমি এখনই তা নিয়ে আসছি'।[২]

আমাদের মতে, শেষোক্ত দুটি অভিমতই ভুল এবং তা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। কারণ হলো, আলোচিত সিংহাসনের ঘটনাটি সাবার সম্রাজ্ঞীর হযরত সুলাইমানের দরবারে উপনীত হওয়ার পূর্বেই ঘটেছিলো। তাজ্জবের বিষয় হলো, প্রকৃতিবাদের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে এত পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল কথা তিনি কীভাবে এড়িয়ে গেলেন? তদ্রূপ সরকারি নিবন্ধক ও রাষ্ট্রীয় নথিপত্রের সঙ্গেও এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, এখন পর্যন্ত তো সম্রাজ্ঞী ও তার সঙ্গীবৃন্দ এবং তাদের উপঢৌকন হযরত সুলাইমান আ.-এর দরবারে পৌঁছে নি। আর যদি এ কথা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, সম্রাজ্ঞীর আগমনের সংবাদ হযরত সুলাইমান আ. ওহির মাধ্যমে পান নি, বরং তিনি হুদহুদ বা সাবার সম্রাজ্ঞীর কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে পেয়েছেন; যিনি

---

১. প্রাগুক্ত

২. আরদুল কুরআন : ১/২৭০

সম্রাজ্ঞীর চিঠি নিয়ে সম্রাজ্ঞীর আগেই রওয়ানা হয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে, এ ধরনের কোনো কথা যেভাবে কুরআনে নেই, তদ্রূপ ইসরাইলি সাহিত্যের কোথাও এ তথ্য পাওয়া যায় না যে, সম্রাজ্ঞীর আগমনের পূর্বেই তার উপঢৌকনের সিংহাসন হযরত সুলাইমানের দরবারে পৌঁছে গিয়েছিলো। কাজেই আপনার আন্দাজের তীর জায়গামতো বসে নি। কাজেই সঠিক ও প্রণিধানযোগ্য অভিমত এটাই যে, ওই লোকটির নাম আসিফ বা অন্য যা-ই হোক না কেনো; প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হযরত সুলাইমানের সাহাবি ও খুব ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন সহচর। যেভাবে হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচর, তেমনি ওই লোকটিও ছিলেন হযরত সুলাইমানের একান্ত কাছের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহচর্যে ধন্য হয়ে তিনি তাওরাত, যাবুরসহ আল্লাহর নাম ও গুণাবলি সম্পর্কিত বিভিন্ন নিগূঢ় জ্ঞান ও রহস্যের গভীর জ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। এ কারণেই যখন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী জনৈক দৈত্য-জিন সাবার সিংহাসন এনে দেয়ার দাবি করলো, যদিও উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে তার বেঁধে দেওয়া সময় যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু হযরত সুলাইমানের হৃদয়ে এ বাসনা ছিলো যে, উল্লিখিত বিশেষ পদক্ষেপটি কোনো দৈত্য-জিনের মাধ্যমে নিষ্পন্ন না হয়ে আল্লাহর কোনো বিশেষ বান্দার হাতে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যাতে তাঁর নবীসুলভ দৃষ্টিনিক্ষেপের মাধ্যমে সেটি একটি 'মুজেযা' ও 'নিদর্শন' হয়ে সাবার সম্রাজ্ঞীর সামনে উপস্থাপিত হয়। আসিফ হযরত সুলাইমানের সেই আন্তরিক বাসনার কথা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ নিজেকে পেশ করলেন এবং সেই দৈত্য-জিনের বেঁধে দেওয়া সময়ের চেয়েও অনেক অল্প সময়ের ভেতর সেটি উপস্থিত করে দেয়ার অঙ্গীকার করলেন। কেননা, তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর বরকতময় দৃষ্টিনিক্ষেপ সেই 'মুজেযা'-কে সত্য করে দেখাবে। আর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে মুজেযা হয়ে থাকে খোদ আল্লাহর নিজের কর্ম, যা তিনি কোনো নবীর মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন (যে বিষয়টি আমরা কাসাসুল কুরআনের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করেছি) তখন হযরত সুলাইমান আ. তাঁর নবুওতের সত্যায়ন ও রিসালাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উল্লিখিত নিদর্শন দেখতে পেয়ে নিম্নের শব্দে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন, هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ অর্থাৎ যা কিছু ঘটেছে, তার মধ্যে আমার বা আসিফের কোনো চেষ্টা বা শক্তির দখল নেই। বরং এটি এককভাবে মহান

আল্লাহর দান। যিনি উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। আর বাস্তবতা হলো, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [এটি মহান আল্লাহর দান, যা তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন। আর আল্লাহ মহান দানের অধিকারী।]

সাবার সম্রাজ্ঞীর ইসলামগ্রহণ

হযরত সুলাইমান আ. ও সাবার সম্রাজ্ঞীর ঘটনা এখানে এসে শেষ হয়েছে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর নবীসুলভ সম্মান ও প্রতিপত্তি দেখে সাবার সম্রাজ্ঞী ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বীকারোক্তি দেন—

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।'

এই ঘটনায় এটাই ছিলো হযরত সুলাইমান আ.-এর একমাত্র লক্ষ্য, যার প্রকাশ তিনি করেছিলেন তাঁর প্রথম চিঠিতেই। যদিও সম্রাজ্ঞী তখন তাঁর উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে সক্ষম হন নি।

সাধারণ মুফাসসিরগণ একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন, তা হলো, যদিও তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হযরত সুলাইমান আ. কর্তৃক সম্রাজ্ঞীকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারটি যথাযথ, কিন্তু এভাবে সিংহাসন উঠিয়ে আনা, স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রাসাদের সামনে সম্রাজ্ঞীকে বিব্রত করার সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যের কী সম্পর্ক? মুফাসসিরগণ নিজেরাই ওই প্রশ্নের এ উত্তর দিয়েছেন যে, এর দ্বারা সাবার সম্রাজ্ঞীর ওপর একটি প্রভাব ফেলতে চেয়েছেন। তা হলো, সম্রাজ্ঞীর মনে যেনো এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, হযরত সুলাইমান আ. তাকে ডেকে পাঠানোর পেছনে কোনো পার্থিব লোভ-লালসা কিংবা সম্পদ ও ঐশ্বর্যে সংযোজনের অভিপ্রায় ছিলো না। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এর চেয়ে আরো অনেক উর্ধ্বের। দ্বিতীয়ত, তিনি চেয়েছেন যেনো সম্রাজ্ঞী এ কথা বুঝতে সমর্থ হন যে, এই দুটি ঘটনা ছিলো রাজসিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিসুলভ শক্তিমত্তার প্রকাশের চেয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠে হযরত সুলাইমান আ.-এর নবীসুলভ সততার নিদর্শন। এ কারণেই মুফাসসিরগণ সাবার সম্রাজ্ঞীর এই মন্তব্য وَكُنَّا مُسْلِمِينَ-এ ইসলাম শব্দের অর্থ নিয়েছেন, ঈমান। অর্থাৎ সত্যিকার অর্থেই সাবার সম্রাজ্ঞী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

যদিও মুফাসসিরগণের প্রজ্ঞাদীপ্ত অভিমতকে আমরা সঠিক বলে স্বীকার করি, কিন্তু তাদের সেই দলিলের ওপর একটি প্রশ্ন ওঠে। তা হলো, যদি এ কথা সঠিক হয় যে, সম্রাজ্ঞী وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ বলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাহলে এর পরের আয়াতের এই দুটি বাক্যের কী অর্থ হবে—

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ

'আল্লাহর পরিবর্তে সে যার উপাসনা করতো, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিলো। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।'

অর্থাৎ স্ফটিকের রাজপ্রাসাদের ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে রানি এ কথা বলেছিলেন—

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।'

এই দুটি বাক্য থেকে মনে হয় যে, وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ বলার সময় তিনি মুসলমান হন নি। বরং এর পরের দ্বিতীয় ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়ে পুনরায় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। অথচ দুটি বিষয়েরই প্রকাশ ঘটেছিলো হযরত সুলাইমান আ.-এর শাহি দরবারে। হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ও ইবনে জারির রহ. এই আপত্তি মেনে নিয়ে আলোচিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ থেকে مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ পর্যন্ত পুরোটাই হযরত সুলাইমান আ.-এর মন্তব্য। কাজেই উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হযরত সুলাইমান আ. বলেছেন, সাবার সম্রাজ্ঞীর এখানে আসার আগ থেকেই আমি জানতাম যে, সম্রাজ্ঞী কাফের সমাজের সদস্য আর আমরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সে যেহেতু সূর্য দেবতার উপাসনা করে, এ কারণে সূর্যপূজা তাকে গায়রুল্লাহর উপাসনায় অভ্যস্ত বানিয়ে একক আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ করে রেখেছে।

ইবনে কাসির রহ. হযরত মুজাহিদ রহ.-এর তাফসির নকল করে লিখেছেন, উল্লিখিত অভিমতটিই প্রাধান্য পাবে। কারণ হলো, সাবার সম্রাজ্ঞী তখন পর্যন্ত মুসলমান হন নি। বরং পবিত্র কুরআনের অভিব্যক্তি অনুসারে তিনি صَرْحٌ مُمَرَّدٌ

مَنْ قَوَارِيْرَ এর ঘটনার পরেই ঈমান এনেছিলেন। কাজেই وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ তার মন্তব্য নয়।

কিন্তু উল্লিখিত তাফসিরে একটি বেশ বড় সমস্যা রয়েছে। তা হলো, তখন ضمير এর مرجع নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা দেখা দেয়। অর্থাৎ যখন قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ বাক্যে قَالَتْ শব্দের বক্তা হচ্ছেন, সাবার সম্রাজ্ঞী। আর এরপর কোথাও হযরত সুলাইমানের উল্লেখ নেই, তখন তার পরের বাক্য وَ أُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ-কে – যা আগের বাক্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে এসেছে – কীভাবে হযরত সুলাইমানের মন্তব্য বলা ঠিক হয়? যদি এ কথা বলা হয় যে, উল্লিখিত দুই বাক্যের মাঝে قال سليمان বা قال শব্দ উহ্য রয়েছে, তাহলে সেটি হবে প্রমাণহীন দাবি মাত্র। কাজেই আমাদের বক্তব্য হলো, যদি ضمير এর مرجع নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করেই সঠিক তাফসির করা যায়, তাহলে বিনা কারণে এ জাতীয় উহ্য মানার কী প্রয়োজন? আলোচিত আয়াতসমূহের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে, যেখানে ওই দুটি সমস্যা বাকি থাকবে না এবং উল্লিখিত দুটি ঘটনার প্রত্যেকটির প্রজ্ঞাদীপ্ত কারণ ও কর্মকৌশল সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার ফুটে উঠবে। যা হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. থেকে হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বলেন,

হযরত সুলাইমান আ. হুদহুদের মাধ্যমে যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাতে এ কথা লেখা ছিলো, وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ। যেখানে তিনি সাবার সম্রাজ্ঞীকে পরিষ্কার ভাষায় ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাবার সম্রাজ্ঞী যেহেতু তাওহিদের বাস্তবতা ও দীনে ইসলামের সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, এ কারণে তিনি হযরত সুলাইমান আ.-এর উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন নি। কারণ, তিনি যখন চিঠিতে أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ এর পর وَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ পড়েছিলেন তখন তিনি অন্যান্য রাজাদের চিঠি-পত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে মনে করেছিলেন, রাজা সুলাইমান তাঁর পরাক্রমশালী শক্তির জোরে আমাকে ও আমার সম্রাজ্যকে তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ করতে চাচ্ছে। এ কারণে রানি তখন তার পারিষদদের সঙ্গে শলা-পরামর্শের পর ভেতরের খোঁজ-খবর জানার জন্য সেই

পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যার কথা কুরআন উল্লেখ করেছে। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাজা সুলাইমানের রাজসিক শক্তি ও পরাক্রমশালী ক্ষমতা অন্য যেকোনো বাদশাহর চেয়ে অনেক বেশি, তখন রানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, সুলাইমানের সঙ্গে লড়তে চাই সমীচীন হবে না। তার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারেই আমাদের কল্যাণ। এ কারণে তিনি শামদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। হযরত সুলাইমান আ. যখন সংবাদ পেলেন যে, সাবার সম্রাজ্ঞী তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছে তখন ভাবলেন, এমন কোনো সূক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার, যার দ্বারা সাবার সম্রাজ্ঞী নিজ থেকেই এ স্বীকারোক্তি প্রদান করতে বাধ্য হবে যে, সূর্যপূজা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতামূলক। কাজেই একক আল্লাহর ইবাদত করাটাই হবে একমাত্র সহজ ও সরল পথ।

সাবা জাতির ধর্ম ছিলো সূর্যপূজা। তারা এ দর্শনের প্রবক্তা ছিলো যে, গোটা জগতের কল্যাণ-অকল্যাণের শক্তি ও ক্ষমতা নক্ষত্রপুঞ্জের হাতে। আর যেহেতু সূর্য হলো সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং তার প্রভাব গোটা জগতের ওপর, এ কারণে একমাত্র সূর্যই উপাসনার যোগ্য। হযরত সুলাইমান আ. এ কারণে সম্রাজ্ঞীকে জানাতে চেয়েছিলেন যে, জগতের ছোট-বড় সবকিছুর ওপর একমাত্র একজনেরই কর্তৃত্ব। আর তিনি হলেন, মহান আল্লাহ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও তারকারাজি; এসবই হলো তাঁর সৃষ্টি। এগুলো হলো তাঁর কুদরতের নিদর্শন। কাজেই একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হলো, মূলস্রষ্টার উপাসনা ছেড়ে তাঁর কুদরতের নিদর্শনের সামনে মাথা নত করা। কেননা, এই নিদর্শনগুলো মূলসত্তার অস্তিত্বের ঘোষক। এগুলো নিজেই মহান উপাস্যের জন্য দলিল। এগুলো নিজেই পরিবর্তনশীল। এগুলোতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অস্তিত্ব, বিনাশ; সবকিছুই হতে পারে। পক্ষান্তরে স্রষ্টার সত্তা এসবের উর্ধ্বে। এ কথা ভেবে তিনি সাবার সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন ইয়ামান থেকে উঠিয়ে আনতে বললেন। যাতে তিনি তার নিকট একটি উদাহরণ দিয়ে তাকে বলতে পারেন এবং তার কাছে এই বিষয় স্পষ্ট করতে পারেন যে, দেখো, এটি হলো আমার দাবির দলিল। এটি তোমার রাজসিংহাসন। চিন্তা করে দেখো, এটি তোমার রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশস্থল। এজন্যই এটিকে 'রাজসিংহাসন' বলা হয়। কিন্তু যখনই তুমি তোমার দেশের বাইরে চলে এলে, তখন তোমার রাজত্বের প্রকাশস্থলও মৌলিকত্বশূন্য হয়ে গেছে। গতকাল যেটি ছিলো তোমার ক্ষমতার প্রকাশ:

আজ সেটি হয়ে গেছে আমার দরবারের সৌন্দর্য। আবার এখানেও তার অবয়ব ও কাঠামোর পরিবর্তন তোমাকে তার অস্থায়িত্বের শিক্ষা দিচ্ছে।

হযরত সুলাইমান আ.-এর ইচ্ছের সমর্থন হয় এ থেকে যে, তিনি সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন তার দরবারে উঠিয়ে এনে তা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়ার সময় বলেছিলেন—

نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

'দেখবো সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই?'

এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে 'হেদায়েত' দ্বারা খাস ইসলামে হেদায়েত উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিষয়ের মূল বাস্তবতার খোঁজ পাওয়াটা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

উল্লিখিত বর্ণনাশৈলীর আলোকে হযরত সুলাইমান আ. সাবার সম্রাজ্ঞীর ওপর এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি শুধু রাজকীয় ক্ষমতা ও কর্তাসুলভ শক্তিমত্তার কারণে নয়, বরং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহান আল্লাহর সেই শক্তি কাজ করছে, যা অপরাপর যে কোনো রাজা-বাদশাহর পরাক্রমশালী ক্ষমতা থেকে অনেক উর্ধ্বে নবীসুলভ সম্মান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে 'ঐশী নিদর্শন'-এর নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাওয়াত ও তাবলিগের উল্লিখিত বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সাবা সমাজের লোকেরা যে সূর্যের পূজা করে থাকে, তা মৌলিকভাবে স্থায়ীকে ছেড়ে অস্থায়ীর, কুদরতকে ছেড়ে কুদরতের প্রকাশস্থলের, অমুখাপেক্ষীকে ছেড়ে মুখাপেক্ষীর, স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির উপাসনা। যা নিতান্তই বিভ্রান্তি ও গুমরাহির পথ। সিরাতে মুসতাকিম হলো, মূলসত্তা একক আল্লাহকেই তাবৎ উপকারিতা, কল্যাণ ও ক্ষতি, অকল্যাণের মালিক বিশ্বাস করতে হবে। শুধু তারই উপাসনা করতে হবে।

কিন্তু সাবা জাতি যেহেতু কয়েক শতাব্দী ধরে গায়রুল্লাহর উপাসনায় বিশ্বাসী ছিলো। এ কারণে সাবার সম্রাজ্ঞী উল্লিখিত সূক্ষ্ম দলিল বুঝতে ব্যর্থ হন। তার বিচার-বুদ্ধি বাস্তবতার গভীরে পৌঁছুতে পারে নি। যার কারণে 'সিংহাসন'-এর পূর্ণ ঘটনা থেকে তিনি এ ফল বের করেন যে, সুলাইমান আ. এই বিস্ময়কর পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁর শক্তি ও প্রতাপের প্রদর্শনী করে আমাকে তার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। সেই ভাবনা থেকেই সাবার সম্রাজ্ঞী এ উত্তর দিয়েছেন যে, 'আপনি যদি এই বিস্ময়কর প্রদর্শনী নাও করতেন, তারপরও আমি পূর্ব থেকেই আপনার ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব

সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছি। আমরা আপনার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি।

সম্রাজ্ঞীর উত্তর উদ্ধৃত করার পর মহান আল্লাহ মাঝখানে তার কয়েক শতাব্দীর গুমরাহি এবং বিষয়টির মূল বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণও জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিয়মিত সূর্যপূজা করাটাই তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। যার কারণে সে এখনও কাফের হয়ে আছে।

নিম্নের আয়াতসমূহে উল্লিখিত দুটি বিষয়ই কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

'বললো, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার উপাসনা করতো, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিলো। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।'

তখন হযরত সুলাইমান আ. দ্বিতীয় প্রদর্শনী করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝানোর ক্ষেত্রে পূর্বটির চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। আর তা হলো স্ফটিকের রাজপ্রাসাদ। সম্রাজ্ঞী যখন মনে করলেন, সামনে দিয়ে পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হচ্ছে আর তাই তিনি তার কাপড় তুলে পানিতে অবতরণের ইচ্ছে করলেন, তখন তাকে বলা হলো, যাকে আপনি পানি মনে করছেন, এটি মূলত কাঁচের প্রতিবিম্ব। পানি নয়। সম্রাজ্ঞীর কাছে তখন সত্য উন্মোচিত হলো। তার মন ভাবনায় পড়ে গেলো যে, হযরত সুলাইমান এই প্রদর্শনীসমূহ দ্বারা কী চাচ্ছেন? তখন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মেধা সত্য বুঝতে সক্ষম হলো যে, যেভাবে আমি এই ভুল করেছি যে, একটি বস্তুর প্রতিবিম্বকে মূলবস্তু মনে করে তার সঙ্গে মূল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণ করতে চেয়েছি, ঠিক অনুরূপ আমি ও আমার জাতি এই গোমরাহিতে নিমগ্ন ছিলাম যে, সূর্যকে উপাসনার যোগ্য মনে করে তাকে পূজা করে গেছি। অথচ বাস্তবে এটি মূল সত্তা এক আল্লাহর কুদরতের প্রকাশস্থলসমূহের একটি। কাজেই তার থেকে বড় জালিম কে আর হতে পারে, যে মূল সত্তাকে ছেড়ে তার প্রকাশস্থলের উপাসনা করতে যায়। তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, হযরত সুলাইমানের রাজকীয় চিঠিতে وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা কী? সম্রাজ্ঞীর মনে ওই ভাবনার উদয় হতেই তিনি চিৎকার করে বললেন—

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সঙ্গে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম।'

শায়খুল হিন্দ রহ.-এর তাফসিরের ফলে আয়াতসমূহের অভ্যন্তরীণ অন্ত্যমিল ও সেগুলোর ضمير সমূহের مرجع নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ও জটিলতা সৃষ্টি হয় না। তা ছাড়া কোনো কিছুকে উহ্য মানার প্রয়োজনও পড়ে না। উপরন্তু ঘটনাদুটির কারণ ও কর্মকৌশল এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর নবীসুলভ দাওয়াত ও ইরশাদ, তাঁর শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তির প্রদর্শনীর যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

সাবার সম্রাজ্ঞীর প্রথম কথা وَكُنَّا مُسْلِمِينَ-এ আমরা ইসলাম শব্দের অর্থ বলেছি, আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এর নজির সুরা হুজুরাতের সেই আয়াত, যা মদীনার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঈমান দাবি করার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

'গ্রাম্য লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান তো আনো নি, তবে এ কথা বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করে অনুগত হয়ে গেছি।'

وَكُنَّا مُسْلِمِينَ বাক্যে ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা আর وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বাক্যে ইসলাম শব্দের অর্থ দীনে ইসলাম গ্রহণ করা।এ দুটির অর্থের মধ্যে কী পার্থক্য তা খোদ পবিত্র কুরআনের ওই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বাক্যে সাবার সম্রাজ্ঞী এমন কোনো বিবরণ পেশ করেন নি, যার থেকে শিরক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাওহিদের আশ্রিত হওয়ার উল্লেখ মেলে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তার ওই বাক্যের পরেও এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এত দিনের সূর্যপূজা এখন পর্যন্ত তাকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছে। যার কারণে এখনও সে কাফের রয়ে গেছে। কিন্তু শেষ বাক্যে যখন সম্রাজ্ঞী স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন যে, এখন তার ইসলাম আক্ষরিক অর্থে নয়, বরং দীনে ইসলামের পারিভাষিক ইসলামই সে গ্রহণ করেছে। সেই আনুগত্য সুলাইমানের জন্য নয়; বরং সুলাইমানের সাহচর্যে 'উভয় জাহানের রব'-এর জন্য নিবেদিত।

সম্ভবত উল্লিখিত পার্থক্যের দিকে তাকিয়েই প্রথম বাক্যে সাবার সম্রাজ্ঞী নিজের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজত্বের সকল পারিষদ ও জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে বহুবচন শব্দে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। কেননা, হযরত সুলাইমানের রাজকীয় প্রতিপত্তির আনুগত্যের বিষয়টি সম্রাজ্ঞী ও তার রাজসভার সদস্যদের মধ্যকার পরামর্শ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত ছিলো। পক্ষান্তরে তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়টি তার একান্তই নিজস্ব বিশ্বাসের ওপর নির্মিত ছিলো। এ কারণে তিনি তা প্রকাশ করার সময় একবচন শব্দে ব্যক্ত করেছেন। যদিও সেই যুগের সাধারণ নীতি অনুসারে রাজার ধর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে জনগণের জনপ্রিয় ধর্ম হয়ে যায়। সম্ভবত পরবর্তীকালে তার জাতিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিলো।

মোটকথা, উল্লিখিত তাফসির খুবই সূক্ষ্ম তথ্যসম্বলিত এবং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রণিধানযোগ্য।

তাওরাতে সাবার সম্রাজ্ঞীর আলোচনা

তাওরাতেও সাবার সম্রাজ্ঞী ও হযরত সুলাইমানের সাক্ষাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সালাতিন অধ্যায়ে রয়েছে—

'আর যখন খোদাওয়ান্দের নাম সম্পর্কে সুলাইমানের খ্যাতি সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি জটিল কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সুলাইমানকে পরীক্ষা করার জন্য তার কাছে আগমন করলেন। বিরাট শোভাযাত্রা ও উষ্ট্রের পাল নিয়ে, যাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি বোঝাই করা ছিলো। এবং বহু স্বর্ণ ও মহামূল্যবান মণি-মুক্তা সঙ্গে নিয়ে জেরুজালেমে পৌঁছলেন। তিনি সুলাইমানের দরবারে এসে তার মনের বিষয়গুলো সহিত তার সঙ্গে আলাপ করলেন। সুলাইমান তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সম্রাজ্ঞীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে সুলাইমান অজ্ঞাত ছিলেন না। সাবার সম্রাজ্ঞী সুলাইমানের সমস্ত জ্ঞান, প্রজ্ঞার বিবরণ এবং সেই শীষমহলটি – যা তিনি সম্রাজ্ঞীর জন্য নির্মাণ করেছিলেন – এবং দস্তরখানের নেয়ামতসমূহকে এবং তার পারিষদবৃন্দের আসনসমূহকে এবং তার উপস্থিত সেবক, চাকর, নওকরবৃন্দ ও তাদের পোশাক, আর সুরা পরিবেশনকারীদেরকে, আর সেই সিঁড়িটিকে –যার দ্বারা তিনি খোদাওয়ান্দের দরবারে গমন করতেন– দেখলেন, তখন সে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। তিনি সুলাইমানকে বললেন, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি আমার রাজ্যে অবস্থানকালে যা অবগত হয়েছিলাম, সেগুলো আজ সত্য বলে প্রতিভাত হলো। আপনার যে

সংবাদ লোকমুখে শুনেছি, তা প্রকৃত অবস্থার অর্ধেকও নয়। কেননা, আপনার প্রজ্ঞা, আভিজাত্য, আড়ম্বর ও জাঁকজমক –যা দেখতে পাচ্ছি– তা আমার শ্রুত সংবাদের চেয়ে বহুগুণ অধিক। আপনার জনবলের সবাই সজ্জন। আপনার বিশেষ লোক, যারা আপনার পারিষদ, তারাও অত্যন্ত সজ্জন। খোদাওয়ান্দ আপনার কথা শ্রবণ করেন। আপনার খোদা মোবারক! যিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, যিনি আপনাকে ইসরাইলের রাজসিংহাসনে বসিয়েছেন। কেননা, খোদাওয়ান্দ ইসরাইলিদেরকে সবসময়ই ভালোবাসেন।[১]

তাওরাতের আলোচনার কোথাও যদিও সম্রাজ্ঞীর মুসলমান হওয়ার উল্লেখ নেই, কিন্তু শেষোক্ত বাক্য থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি ইসরাইলিদের খোদার ওপর ঈমান এনেছিলেন। এ কারণেই তিনি তার কথা উল্লেখ করছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

কিন্তু কুরআন ও তাওরাতের আলোচনায় সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, পবিত্র কুরআনের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, হযরত সুলাইমান আ. সাবার সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যে আচরণ করেছে, সেখানে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে দীনের প্রতি দাওয়াত প্রদানকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এর বিপরীতে তাওরাতের আলোচনা থেকে হযরত সুলাইমানের প্রখর মেধা ও রাজকীয় কর্তৃত্ব ছাড়া অন্যকোনো কিছু প্রতিভাত হয় না। মূলত এটি হচ্ছে হযরত সুলাইমানের প্রতি বনি ইসরাইলের ভুল বিশ্বাসের পরিণতি। তারা তাঁর সম্পর্কে এই ভুল বিশ্বাস আবিষ্কার করে নিয়েছে যে, তিনি একজন রাজামাত্র। এর বাইরে তারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করে না।

আর পবিত্র কুরআন যেভাবে আকিদা ও আমলের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ ও তাদের নবী-রাসুল সম্পর্কিত ঘটনাবলির ক্ষেত্রে বনি ইসরাইলের বিকার-বিকৃতি ও তাদের ভ্রান্ত ও অনর্থক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রগুলোকে সংস্কার ও পরিশোধিত করেছে, তারই ধারাবাহিকতায় এখানেও হযরত সুলাইমান আ. সম্পর্কিত সঠিক বাস্তবতার উদ্‌ঘাটন করেছে এবং তাদের ভুলগুলোকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, যা তাদের বর্তমান গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান।

---

[১] অধ্যায় : ২০, আয়াত : ১-১০

হযরত সুলাইমানের সঙ্গে সাবার সম্রাজ্ঞীর পরিণয়

তাফসিরের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সুলাইমান আ. সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকিসকে বিয়ে করেন এবং তাকে নিজ দেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। হযরত সুলাইমান আ. মাঝে-মধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।[১] যদিও পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সহিহ কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই।

ইসরাইলি বর্ণনা

বিলকিস, সাবার সম্রাজ্ঞী ও হযরত সুলাইমান আ.-এর উল্লিখিত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশদ বিবরণ ছাড়াও আরো কিছু বিস্ময়কর ও বিরল কথাবার্তা সিরাতের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। যা আদ্যোপান্ত ইসরাইলি বর্ণনা ও ইহুদিদের উদ্ভট সাহিত্য হতে সংগৃহীত। সেগুলো সম্পর্কে ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসিরে যে মন্তব্য করেছেন, তার সারনির্যাস নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে

'এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি বিস্ময়কর রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। যা ইবনুস সায়িবের উদ্ধৃতিতে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি সম্পর্কে ইবনে আবি শায়বা বলেছেন, এটি খুবই চিত্তাকর্ষক ঘটনা। কিন্তু আমি বলবো, ইবনে আবি শায়বার ওই মন্তব্য করা ঠিক হয় নি। উল্লিখিত রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য। এটি বর্ণনা করার সময় অবশ্যই আতা ইবনে সায়িব ভুল করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর দিকে সনদের সূত্র যুক্ত করেছেন। যুক্তিও এ কথা বলে যে, এ জাতীয় বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে আহলে কিতাবদের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। ঘটনার বিবরণের প্রকৃতিই বলে দেয় যে, এটি কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বনি ইসরাইলের যেসব ঘটনা তাদের গ্রন্থাবলি থেকে নকল করে এই উম্মতকে শুনাতেন, তার অনুরূপ। মহান আল্লাহ তাদের সঙ্গে ক্ষমার আচরণ করুন। কেননা, তাদের কেচ্ছা-কাহিনিতে অবাক করা, বিরল ও পরিত্যাজ্য কথা বার্তা রয়েছে। সেখানে রয়েছে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ। তার পূর্ণ বিকৃত, আধা বিকৃত ও স্বল্প বিকৃত, সবধরনের ঘটনাই নকল করতেন। অথচ মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরনের অবান্তর ও অনর্থক প্যাঁচাল থেকে সন্দেহাতীতভাবে অমুখাপেক্ষী ও পরোয়াহীন করেছেন। আমাদেরকে এমন ইলম (কুরআন) দান করেছেন, যা ঘটনার সত্যতা,

---

[১]. তারিখে ইবনে কাসির : ২/২৪

সদিচ্ছার উপকারিতা, অর্থের স্পষ্টতা ও ভাষার-অলঙ্কারের সাহিত্যমান উত্তীর্ণতার বিচারে অনেক উন্নত ও বলিষ্ঠ।[১]

কাসাসুল কুরআনে বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণকালে বারংবার বলা হচ্ছে যে, অমুক রেওয়ায়েত সহিহ আর অমুক বর্ণনাটি ইসরাইলি। এখানে ইসরাইলি বলতে কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করা দরকার।

বনি ইসরাইলের রেওয়ায়েতগুলোর সিংহভাগ উৎস হলো তাওরাত। ইবরানি ভাষায় 'তাওরাত' শব্দের অর্থ 'শরিয়ত'। এ কারণে সেটির সাধারণ প্রয়োগ 'সিফরে তাকউন' (জন্মবৃত্তান্ত), 'সিফরে খুরুজ', 'সিফরে আহবার', 'সিফরে আদদ', 'সিফরে ইসতিসনা'-এর ওপর হয়ে থাকে।

তাওরাতের বাইরে দ্বিতীয় উৎস হলো, 'নবিইম'। এটি ইবরানি ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী 'নবী' শব্দের বহুবচন। ইবরানি ভাষায় একবচনের শেষে ي ও م যোগ করে বহুবচন সৃষ্টি হয়। এটি হলো, বনি ইসরাইলের বিভিন্ন নবীদের নসিহত, শোকগাথা, বনি ইসরাইলের কথাসাহিত্য ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের ভাণ্ডার। তার মধ্যে 'সিফরে ইউশা', 'সিফরুল কুযাত', 'সিফরে স্যামুয়েল', 'সিফরে আইয়্যাম' ও 'সিফরে মুলুক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল 'নবিইম'-কে তাওরাতেরই অংশ মনে করা হয়।

তৃতীয় উৎস হলো, 'তুরকুম'। আরবি ভাষায় 'অনুবাদ'-কে বলা হয়। ইহুদি পণ্ডিতগণ তাওরাত ও নবিঈমের আরামি ভাষায় তাফসির করেছেন। এটি সম্পর্কে তাদের দাবি হলো, তারা এই তাফসির বিভিন্ন নবীদের কাছ থেকে শুনেছেন। চতুর্থ উৎস হলো, 'মাদরাশ'। ইসলামে হাদিসের যে মর্যাদা, ইহুদিদের সমাজে 'মাদরাশ'-এরও একই মর্যাদা। পঞ্চম উৎস হলো, তালমুদ। এটি হলো বনি ইসরাইলের ফিকাহ।

এগুলো ছাড়াও আরো কিছু ঘটনা ও কাহিনি রয়েছে, যেগুলো তাদের সমাজে বক্ষ থেকে বক্ষে স্মৃতিশক্তির মাধ্যমে ধর্মীয় পুঁথি হিসেবে বর্ণিত হয়ে আসছে। ইহুদি সাহিত্যের উল্লিখিত সবগুলো প্রকারকে এক নামে 'ইসরাইলিয়্যাত' বলা হয়ে থাকে। যেসকল ইহুদি পণ্ডিত পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে ছিলেন; তাদের মাধ্যমে ইসরাইলিয়্যাতের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মুসলমানদের মধ্যে চর্চিত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ কারণে মুহাককিক উলামায়ে কেরাম সর্বযুগেই সেগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সেগুলো থেকে

---

[১] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৩৬৫,৩৬৬

ইসলামি রেওয়ায়েতকে পবিত্র রাখার কাজ করে গেছেন। এক্ষেত্রে তারা কেবল সেসব বর্ণনাকেই ছাড় দিয়েছেন, যেগুলোর ভাষ্যের সমর্থনে পবিত্র কুরআন অথবা সহিহ হাদিসের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

হযরত সুলাইমানের চিঠির বিস্ময়কর ক্ষমতা

সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, হযরত সুলাইমান আ. সাবার সম্রাজ্ঞীকে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি পৃথিবীর অদ্যাবধি পর্যন্ত প্রেরিত সকল চিঠির মধ্যে সেরা। আজ পর্যন্ত এটির কোনো নজির পাওয়া যায় নি। কেবল সুধারণার বশবর্তী হয়ে এ দাবি করা হয় নি; বরং এর পেছনে দলিলও রয়েছে। তা হলো, এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে এত সংক্ষিপ্ত অথচ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট, সাহিত্য-অলঙ্কারের ক্ষেত্রে খুবই উচ্চমান সম্পন্ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাচনশৈলীর বিচারে অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট, যথেষ্ট ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও গাম্ভীর্যময়, মোটকথা, সামষ্টিক গুণাবলিসমৃদ্ধ এমন আরেকটি চিঠি ইতিহাসের দ্বিতীয় কোনো মহান ব্যক্তির জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

চিঠির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সমস্যা সৃষ্টি না করে নেহায়েত সংক্ষিপ্তাকারে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব, স্রষ্টাত্ব ও আধিপত্যের প্রকাশ, নবীসুলভ সত্যবার্তার ঘোষণা, রাজকীয় ক্ষমতা ও রাজসিক প্রতিপত্তির প্রদর্শনী এবং নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচয় ইত্যাকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে কতোটা পারঙ্গমতার সঙ্গে ব্যক্ত করা যায়; তার একমাত্র উদাহরণ এই চিঠি। যেনো এখানে বিন্দুতে গোটা সিন্ধুকে ভরে দেয়া হয়েছে।

চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে দেখুন আর এরপর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, আপনিও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, শব্দ ও অর্থের মেলবন্ধনে এই চিঠি একটি জীবন্ত মুজেযা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

'সেই পত্রটি সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।'

হযরত সুলাইমান ও বনি ইসরাইলের মিথ্যাচার

ইতোপূর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে এ কথা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বনি ইসরাইল তাদের ঐশী কিতাবগুলোতে বারংবার বিকৃতি সাধন করেছে। তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সর্বধরনের রদ-বদল করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত দাউদ ও সুলাইমান আ.-এর ক্ষেত্রে তাদের দুঃসাহস এতটাই প্রকট হয়েছে যে, তারা তাদের নবুয়ত ও রিসালাতকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। তাঁদের ওপর নানা রকমের অপবাদ ও অর্থহীন মিথ্যাচার নিক্ষেপ করেছে। তাদের সেসকল অবান্তর অপলাপের একটি হলো, তারা হযরত সুলাইমান সম্পর্কে বলেছে যে, তিনি জাদু জানতেন। আর সে জোরেই তিনি 'কিং সুলাইমান' হতে পেরেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি মানব-দানব, জিন-দৈত্য, পশু-পাখি; সবকিছুকেই বশীভূত করে রেখেছিলেন।

পবিত্র কুরআন তার দায়িত্ব পালন করে বনি ইসরাইলের আরোপিত অপবাদ দালিলিকভাবে খণ্ডন করেছে এবং হযরত সুলাইমান আ.-এর নবীসুলভ শ্রেষ্ঠত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। কুরআন এ কথা স্পষ্ট করেছে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর শুভ্র জামা জাদুর কালিমা থেকে পবিত্র। আসল ইতিহাস হলো, হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগে বনি ইসরাইলকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান কিছু (মানব ও জিন)-কে যাদু শেখায়। রীতিমতো এটিকে বিন্যস্ত আকারে পেশ করে। তখন বনি ইসরাইলিরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও যাবুর)-কে ছেড়ে দিয়ে এটিকেই খোদায়ি কানুন মনে করে তার চর্চায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। যাদুচর্চাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে তাদের তাবৎ মনোযোগ। যখন বনি ইসরাইলের মুষ্টিমেয় হকপন্থী তাদেরকে বুঝায় যে, তোমরা যা করছো তা গোমরাহি ও কুফরি ছাড়া কিছু নয়। তোমরা এর থেকে ফিরে এসো। তখন শয়তানের কুমন্ত্রণায় তারা এর উত্তরে বলে যে, এটি সুলাইমানের শেখানো বিদ্যা। এর বলেই সুলাইমান এত বড় রাজত্বের অধিপতি হতে পেরেছিলেন। তারা তাদের গোমরাহির ঢাল হিসেবে হযরত সুলাইমানকে ব্যবহার করতে থাকে। অথচ আদতে তা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুদ্দি বলেন, হযরত সুলাইমান আ. বেঁচে থাকতেই বনি ইসরাইলিরা ওই গুমরাহি শুরু করে দিয়েছিলো। তাদের মধ্যে এ কথা খুব চাউর হয়ে গিয়েছিলো যে, 'জিনেরা' ইলমে গায়ব জানে। যখন হযরত সুলাইমান আ. এর সংবাদ পান, তখন তিনি শয়তানদের ওই সকল লিখিত পুঁথি সংগ্রহ করে তাঁর সিংহাসনের নিচে মাটিচাপা দিয়েছিলেন। যাতে কোনো মানুষ বা জিন

ওখানে পৌঁছানোর দুঃসাহস না করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ ফরমানও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি যাদু করবে অথবা জিনদের সম্পর্কে অদৃশ্যের জ্ঞান ধারণের বিশ্বাস পোষণ করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু হযরত সুলাইমান আ.-এর পরলোকগমনের পর কতিপয় শয়তান সেই মাটিচাপা দেয়া ভাণ্ডার পুনরায় উত্তোলন করে। তারা তখন বনি ইসরাইলে মধ্যে এ বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয় যে, এই জাদুর শাস্ত্রটি হলো হযরত সুলাইমানের বিদ্যা। তিনি এ শক্তি দিয়েই মানুষ, জিন, পশু, পাখি ও বাতাসের ওপর রাজত্ব করতেন। এভাবে তারা বনি ইসরাইলের মধ্যে পুনরায় জাদুর বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়।[১]

পবিত্র কুরআন ওই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অন্য একটি বিষয়বস্তুর অধীন উপস্থাপন করেছে। বিষয়বস্তুটি হলো, বনি ইসরাইলিরা ভালো করেই জানে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী। তাঁর নবুওতের সুসংবাদ সম্বলিত অগুনতি ভাষ্য তারা প্রাচীন ঐশী কিতাবসমূহে অধ্যয়ন করেছে। তারপরও তারা হঠধর্মিকতার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর এই মহান নবীর নবুয়ত ও রিসালাতকে ঠুকরাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা ঐশী কিতাবসমূহকে পশ্চাতে ফেলে শয়তানের সেভাবেই অনুগমন করছে, যেভাবে তারা ইতোপূর্বে শয়তানের অনুগমন করেছিলো হযরত সুলাইমান আ.-এর যুগে জাদুর ক্ষেত্রে। তারা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে হযরত সুলাইমানের দিকে কুফরি যাদুর সম্বন্ধ জুড়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতসমূহ ও তার পূর্বাপর ভাষ্যগুলো উল্লিখিত বাস্তবতাকে খুব স্পষ্টাকারে ফুটিয়ে তুলেছে এভাবে—

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ () وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

---

[১]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১/১৩৪

'যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসুল আগমন করলেন– যিনি ওই কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কিতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো – যেনো তারা জানেই না। তারা ওই শাস্ত্রের অনুসরণ করলো, যা সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করতো। সুলাইমান কুফরি করে নি; শয়তানরাই কুফর করছিলো। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিলো, তা শিক্ষা দিতো। তারা উভয়েই এ কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিতো না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখতো, যার দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারতো না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ – যদি তারা জানতো!' [সুরা বাকারা : ১০১-১০২]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে সত্য ব্যক্ত করা হয়েছে তা নিরূপণের ক্ষেত্রে তাফসিরকারদের ভিন্ন ভিন্ন অভিরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ হলো, পূর্বেকার পৃষ্ঠাসমূহে যে তিনটি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে; তার বাইরে ঘটনার বাকি অংশে কী রয়েছে, এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কারণ প্রত্যেকের জানা। আর তা হলো পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্যের জন্য সেগুলো প্রয়োজনীয় নয়। এ কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলোর তাফসির করার সময় আমরা সাধারণ তাফসির থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছি। যে পথ রচনা করেছেন, যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লাহর অন্যতম কুদরতি নিদর্শন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.। হযরতুল উসতাযের তাফসিরের সারাংশ হলো—

'যখন বনি ইসরাইলকে শয়তান যাদু শিখিয়ে গুমরাহ করলো এবং তারা শয়তানকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত বিশ্বাস করতে লাগলো আর এটি সেই সময়কার কথা, যখন হযরত সুলাইমান আ. ইন্তিকাল করেছেন। তখন তাদের মধ্যে আল্লাহর কোনো নবী উপস্থিত ছিলেন না। তখন বনি ইসরাইলকে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে সামাল দেয়ার জন্য মুজেযাসুলভ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যা কয়েক শতাব্দী যাবৎ মহান আল্লাহর চিরন্তন নীতি হিসেবে নিয়মিত পালিত হয়ে আসছে। আর তা হলো, আসমান থেকে হারুত ও

মারুত নামের দুই ফেরেশতা অবতরণ করেন। তারা তাওরাত থেকে আল্লাহর নাম ও সিফাতের রহস্য সংগ্রহ করে বনি ইসরাইলকে এমন এক বিদ্যা শিক্ষা দেন, যা ছিলো তখনকার প্রচলিত যাদুবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও তার নাপাক আসর/প্রভাব থেকে আদ্যোপান্ত পবিত্র। যার কারণে একজন ইসরাইলি খুব সহজেই বুঝতে পারতো যে, এটি হলো 'যাদু' আর এটি হলো 'আসমানি রহস্য বিদ্যা'। ওই দুই ফেরেশতা যখন বনি ইসরাইলকে উল্লিখিত বিদ্যা শেখাতেন, তখন এ নসিহত করতেন যে, যখন তোমাদের সামনে মূল বাস্তবতা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে এবং হক-বাতিলের চাক্ষুষ পার্থক্য যখন তোমরা চর্মচোখে অবলোকন করেছো, এরপরও যদি আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে যাদুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, তাহলে নির্ঘাত তোমরা কাফের হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহর প্রামাণিকত্ব তোমাদের সামনে পূর্ণতা পেয়েছে। কাজেই এর পর তোমাদের কোনো অজুহাত পেশ করার সুযোগ নেই। যেনো আমাদের অস্তিত্ব তোমাদের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষা; এভাবে যে, তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার পরও কি শয়তানের অনুগত হয়ে 'যাদু বিদ্যা'-এর ভক্ত হয়ে থাকো না-কি তার থেকে অধিক শক্তিশালী সত্যবিদ্যা 'আল্লাহর কিতাব'-এর অনুগত হও?

কিন্তু বনি ইসরাইলের চিরন্তন বক্র স্বভাব এক্ষেত্রেও তাদের সঙ্গ ছাড়ে নি। তারা সেই পবিত্র ঐশী বিদ্যাকেও নাজায়েয ও হারাম মনোবৃত্তি পূরণের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্যায়ভাবে বিভেদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এভাবে তারা বাতিলের সঙ্গে সত্যকে মিশ্রিত করে সেটিকেও একটি কারিশমা বানিয়ে ফেলে। আর বাতিলের সঙ্গে হককে মিশ্রিত করা অথবা কোনো পবিত্র বাক্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়াকে নাজায়েয ও হারাম কাজে ব্যবহার করা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে যে, এটিও তখন যাদুকাণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করে ফেলে। এ কারণে তা হারাম ও কুফরি।'[১]

হযরত শাহ সাহেব রহ.-এর উল্লিখিত তাফসির অনুযায়ী وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ-এ مَآ শব্দটি নাবাচক নয়। বরং এটি الذي এর অর্থে।[২] কারণ হলো, আয়াতে سحر ও وَمَآ اُنْزِلَ এর মাঝখানে عطف এর সম্পর্ক। আর আরবি

---

[১]. শাহ আবদুল কাদির রহ. প্রণীত মুদিহুল কুরআন। فقبضت قبضة من اثر الرسول আয়াত সংক্রান্ত আলোচনা। কিতাবুন নবুওত; শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া রচিত।

[২]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ১

ব্যাকরণের কায়দা অনুযায়ী عطف আসে আলোচনার ভিন্নতার জন্য। কাজেই আলোচিত আয়াতে سحر হলো এক জিনিস, যা শয়তানের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। আর ফেরেশতাদের আনীত ইলম হলো অন্য জিনিস, যা পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। কাজেই ফেরেশতাদের দিকে যাদুর নিসবত করা সঠিক হবে না। উল্লিখিত তাফসিরটি অর্থের ধারাবাহিকতা, পূর্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং বাস্তবতা ও মৌলিকত্বের সুস্পষ্টতার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই বাস্তবতাশ্রিত। এ কারণেই আমরা উল্লিখিত তাফসিরকে প্রাধান্য দিয়েছি।

এই তাফসির ছাড়াও আরো একটি প্রসিদ্ধ তাফসির প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফাররা রহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে। আর তা হলো, وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ-এ مَآ শব্দটি নাবাচক। তিনি বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, বনি ইসরাইলের মধ্যে যাদুবিদ্যা শয়তানের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। তাদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল যে, এটি সুলাইমানের বিদ্যা। তাদের নিম্নের কথাগুলোও ভুল যে, বাবেল নগরীতে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতা অবতরণ করেছেন এবং বনি ইসরাইলকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছেন এবং শেখানোর সময় তারা এ মর্মে সতর্ক করতেন যে, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষা হয়ে প্রেরিত হয়েছি। তবে তোমরা যদি শেখতে চাও তাহলে তোমাদের তা শেখাবো। কিন্তু এর ফলে তোমরা কাফের হয়ে যাবে। এ কারণে তোমাদেরকে নসিহত করছি যে, তোমরা কুফরি অবলম্বন করো না। কিন্তু এরপরও যখন বনি ইসরাইল উপর্যুপরি অনুরোধ করতো তখন তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ তৈরি করার যাদু শেখাতেন। এ জাতীয় যেসব কাহিনি বনি ইসরাইলদের মধ্যে বহুল চর্চিত রয়েছে, তার সবই ভুল। আদতে এমন কিছুই ঘটে নি।

তৃতীয় আরেকটি তাফসির ইমাম কুরতুবি রহ. থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে জারির রহ.ও সেটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তা হলো, وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ-এ مَآ শব্দটি নাবাচক। আর হারুত ও মারুত শব্দ দুটি শয়তানের بدل। কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এ কথা ভুল যে, বনি ইসরাইলের পরীক্ষার জন্য আসমানের ফেরেশতা سحر এর ইলম নিয়ে এসেছিলেন। বরং শয়তানই তাদেরকে যাদু শেখাতো। যাদের মধ্যে বাবেল নগরীর দুই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হারুত ও মারুতও ছিলো। তারা যখন যাদু শেখাতো তখন বনি ইসরাইলের ধর্মীয় জীবন নিয়ে বিদ্রূপ করে বলতো যে, দেখো, যদি তোমরা আমাদের কাছ থেকে এই سحر (যাদু) শেখো তাহলে কিন্তু তোমরা কাফের

হয়ে যাবে! কিন্তু সেসময় বনি ইসরাইলিরা এতটাই গুমরাহ হয়ে গিয়েছিলো যে, এত কিছু জানা-শোনার পরও তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিভেদ তৈরির যাদু শেখতো এবং আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করতো।

আমাদের অভিমত হলো, শেষোক্ত তাফসিরদুটি সাধারণ তাফসিরগুলোর চেয়ে ঢের উত্তম। কেননা, সাধারণ তাফসিরসমূহে وَمَا শব্দটিকে الذي এর অর্থে মেনে নিয়ে এ ব্যাখ্যা করা হয় যে, বাবেল নগরীতে হারুত ও মারুত নামের দুই ফেরেশতা বনি ইসরাইলকে পরীক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়ে যাদু শেখাতো। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথা বলে সতর্কও করতো যে, আমাদের কাছ থেকে এ বিদ্যা শেখো না। নয়তো কাফের হয়ে যাবে। তাদের এই ব্যাখ্যা মানতে গেলে অকারণে অনেকগুলো আপত্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত বিনা দলিলে وَمَا أُنْزِلَ আর سحر একই বস্তু বলে স্বীকার করতে হয়।

উল্লিখিত তাফসিরসমূহ ছাড়াও আলোচিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে বেশ কিছু উদ্ভট কথাবার্তা বিভিন্ন সাহাবির বরাতে এমনকি একটি মারফু রেওয়ায়েত তাফসিরের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। অথচ বাস্তবে এগুলো কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিতও নয়, কিংবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিতও নয়। বরং কা'ব আহবারসহ অন্যান্য ইহুদি পণ্ডিতদের মাধ্যমে এগুলো ছড়িয়েছে। যেগুলোকে বনি ইসরাইলিদের উর্বর মস্তিষ্কের রচনা ছাড়া আর কীইবা বলা যেতে পারে। সেই গল্পগুলোর সারাংশ হলো, হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় একবার মহান আল্লাহর দরবারে মানবজাতির গুনাহ করা নিয়ে বিদ্রূপ করে। তারা উপহাস করে বলে যে, এরা কতটা নিকৃষ্ট সৃষ্টি যে, মহান আল্লাহর সর্বধরনের নেয়ামত লাভ করা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাদের এই বিদ্রূপ আল্লাহর পছন্দ হয় নি। তিনি তখন তাদেরকে বলেন, যদি তোমরা দুনিয়ার পরিবেশে আটকা পড়তে, তাহলে তোমরাও এমনি করতে। ফেরেশতাদ্বয় তখন নিজেদের নিষ্পাপত্ব ও নিষ্কলুষতার ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। যার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মাটিতে নামিয়ে দেন। পৃথিবীতে বসবাস করা অবস্থায় একবার তাদের দৃষ্টি পড়ে যায় অতীব সুন্দরী ললনা 'যুহরা'-এর ওপর। তারা দু-জনই তার প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়ে। যুহরার নৈকট্য পেতে তাদের মন প্রচণ্ড উদগ্রীব হতে থাকে। যুহরা তখন তাদের উদ্দেশে এ শর্ত ছুঁড়ে দেয় যে, যতক্ষণ তোমরা দু-জন মদ পান করবে না, হত্যা করবে না

এবং মূর্তিপূজা করবে না, ততক্ষণ তোমরা আমাকে পাবে না। যুহরার প্রেমে অন্ধ হয়ে হারুত ও মারুত উল্লিখিত তিন কাজ করে ফেলে।

যুহরা একান্ত অবস্থায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, তারা কিভাবে আকাশে গমন করে? ফেরেশতাদ্বয় তখন তাকে ইসমে আযম শিখিয়ে দেয়। যুহরা সেই ইসমে আযম পড়ে আকাশে চলে যায়। ওদিকে ওই দুই ফেরেশতার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসে। তাদেরকে বাবেল নগরীর কুয়ায় বন্দি করা হয়। বনি ইসরাইলের লোকেরা তাদের কাছে জাদু শিখতে আসতো। তাদের কাছে কেউ জাদু শেখানোর আবেদন করলে, প্রথমে তারা নিষেধ করতো এবং কাফের হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাতো। কিন্তু জোরাজুরি করলে যাদু শিখিয়ে দিতো। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করতো, তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছো? ওই ব্যক্তি তখন বলতো, নুরানি অবয়বের এক ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি, যিনি ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে চলে যাচ্ছেন। ফেরেশতা তখন বলতো, এটি হলো তোমার ঈমান, যা তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন তুমি যাদুকর হয়ে গেছো। সেই ফেরেশতাদ্বয় কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তির কারণে এভাবে কুয়োর ভেতর উল্টো ঝুলে থাকবে।

গল্পটি যে বানোয়াট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মুহাককিকগণ সবসময় বলে এসেছেন যে, এটি একটি উদ্ভট গাল-গল্প। ইসলামি রেওয়ায়েতের ভাণ্ডার সর্বদাই এ জাতীয় কালিমা থেকে পবিত্র। আল্লামা ইবনে কাসির রহ. প্রথমে এটির মারফু হওয়ার ওপর আপত্তি পেশ করে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন

واقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

এক্ষেত্রে সত্যঘনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত হলো, এটি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়। বরং কা'ব ইবনে আহবার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণনা।

فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني اسرائيل.

'কাজেই আলোচনার শেষকথা হলো, যে রেওয়ায়েতটিকে মারফু বলা হয়, সেটি অবশেষে প্রতিপন্ন হলো, কা'ব ইবনে আহবারের বর্ণনা। যা তিনি উঠিয়ে এনেছেন বনি ইসরাইলের রচনা থেকে।'[১]

---

[১]. তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড : ১

এটি গেলো নবীজির দিকে জড়িয়ে দেওয়া তথাকথিত মারফু হাদিস সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আর বিভিন্ন সাহাবি ও তাবেঈদেরকে জড়িয়ে যেসব বর্ণনা দাঁড় করানো হয়, তার ওপর আল্লামা ইবনে কাসির রহ. যে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, নিম্নে তার সারসংক্ষেপ পেশ করা হলো

হারুত ও মারুতের এই গল্প (যুহরা ও বাবেলের কুয়োর ঘটনা) তাবেঈদের বেশ বড় একটি জামাত বর্ণনা করেছেন। যেমন, মুজাহিদ, সুদ্দি, হাসান বসরি, কাতাদাহ, আবুল আলিয়াহ, যুহরি, রবি বিন আনাস, মুকাতিল, ইবনে হিব্বান প্রমুখ। متقدمين ও متأخرين- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্য হতে অনেকেই তাদের থেকে নকল করেছেন। কিন্তু সমস্ত নকলের অবস্থা হলো, সেখানে যে সব বিশদ বিবরণ বর্ণিত রয়েছে, তার সমুদয়-ই বনি ইসরাইলিদের কেচ্ছা-কাহিনি থেকে আহরিত। যেহেতু চিরকালীন সত্যবাদী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –(তিনি নিজের মন থেকে কোনো কথা বলতেন না, যা কিছু বলতেন, ওহি থেকে জেনেই বলতেন)– থেকে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা হাদিসের বিশাল ও বিপুল ভাণ্ডারে উপস্থিত নেই। আর পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক আলোচনা ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত রেখেছে। কোনো বিশদ ব্যাখ্যা বা বিবরণ জানায় নি। কাজেই আমাদের বিশ্বাস হলো, পবিত্র কুরআন এক্ষেত্রে যতটুকু বলেছে, ততটুকুই সত্য। আল্লাহ তাআলার কাছে এর বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা কী? তা একমাত্র তিনি-ই জানেন। আমরা তার ওপরই সোপর্দ করবো।[২]

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন উল্লিখিত ঘটনাটিকে যে উদ্দেশে বয়ান করেছে, তা শুধু এতটুকুই যে, হযরত সুলাইমান আ. জাদুচর্চা করতেন; বনি ইসরাইলের এই দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যাচার। এটি ছিলো মূলত শয়তানের কাজ। হযরত সুলাইমানের শুভ্র ব্যক্তিত্ব এ জাতীয় কালিমা থেকে পবিত্র। বনি ইসরাইলিরা বরাবরের মতো এক্ষেত্রেও আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাদ্দেশে নিক্ষেপ করে শয়তানের লেজুড়বৃত্তি করেছে। ঘটনার বাকি বিবরণ উপেক্ষা করে শুধু এতটুকু সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ওপরই পবিত্র কুরআন নির্ভর করেছে। কাজেই আমাদের জন্যও ওইটুকু সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের ওপর ঈমান আনাই যথেষ্ট। তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার বিষয়টিকে আল্লাহর সোপর্দ করাই সবচেয়ে উত্তম তরিকা। কেননা, উল্লিখিত বিশদ বিবরণের সঙ্গে দীন ও মিল্লাতের কোনো বিষয় নির্ভরশীল বা জড়িত নয়।

---

২. আল বাহরুল মুহিত, প্রথম খণ্ড

ইবনে কাসির রহ.-এর উল্লিখিত অভিমতের সমর্থন আরো অনেক মুহাককিক জানিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ও আবু হাইয়ান উন্দুলুসি রহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত সুলাইমানের পরলোকগমন

পবিত্র কুরআন সুরা সাবায় হযরত সুলাইমান আ.-এর ইন্তিকালের যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, তার সারসংক্ষেপ হলো, হযরত সুলাইমানের নির্দেশে জিনদের বেশ বড় একটি দল বিশাল একটি ভবনের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলো। ইতোমধ্যে হযরত সুলাইমানের কাছে মৃত্যুর বার্তা চলে আসে। কিন্তু তাঁর পরলোকগমনের বিষয়টি জিনরা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। তারা তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলো। অনেক দিন পর যখন উইপোকা তার লাঠি খেয়ে ফেলে তখন তিনি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। অথচ এত দিন দূর থেকে মনে হতো, হযরত সুলাইমান আ. সেই লাঠির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন জিনজাতি বুঝতে পারে যে, হযরত সুলাইমান আ. অনেক দিন পূর্বেই গত হয়েছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা তা জানতে পারি নি। হায়, আমরা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান জানতাম, তাহলে এত দীর্ঘ দিন আমাদেরকে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হতো না। অথচ সুলাইমানের ভয়ে আমরা এত দিন কষ্ট সহ্য করে আসছি। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

‘যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণপোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত করলো। তারা সুলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিলো। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলো, তখন জিনরা বুঝতে পারলো যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।’ [সুরা সাবা : আয়াত ১৪]

কথিত আছে, উল্লিখিত রহস্য যতক্ষণে জিনদের সামনে উন্মোচিত হয়, ততক্ষণে নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। যার কারণে জিনরা প্রচণ্ড আক্ষেপ করছিলো যে, হায়, তারা যদি গায়ব জানতো, তাহলে অনেক আগেই মুক্তি পেয়ে যেতো।

এই স্থানে পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য দুটি : ১. হযরত সুলাইমান আ.-এর ইন্তিকালের বিবরণ জানানো। ২. বনি ইসরাইলকে তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য

সতর্ক করা। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, জিনজাতি গায়বের খবর জানে। উল্লিখিত আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, জিনরা যদি প্রকৃতই গায়বের খবর জানতো, তাহলে তারা এই দীর্ঘ সময় হযরত সুলাইমানের ভয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ অথবা অন্যকোনো নগরীর নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকার মতো হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের শিকার হতো না। তারা যেভাবে হযরত সুলাইমানের ইন্তিকালের বিষয়টি জানতে পেরেছে, তার প্রেক্ষিতে খোদ তাদেরকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে, আমাদের ব্যাপারে গায়বের খবর জানার বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ অমূলক।

হযরত সুলাইমান আ.-এর ইন্তিকাল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এতটুকুই জানিয়েছে। এর অতিরিক্ত বিবরণ দেয় নি। দীন প্রচারের যে উদ্দেশ্যে কুরআনের অবতরণ; তার সঙ্গে অতিরিক্ত বিবরণের কোনো সম্পর্কও নেই। কাজেই এই বিশদ বিবরণের সঙ্গে আমাদেরও কোনো সম্পর্ক নেই যে, হযরত সুলাইমান আ. কতদিন লাঠির সাহায্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কীভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ শুধু বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সামান্য দূরত্বে নির্মাণকাজে নিমগ্ন জিনরাই জানতো না না-কি জিন ও মানুষ উভয় জাতিই জানতো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে ইসরাইলি ভাণ্ডার হতে সংগৃহীত একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত সুলাইমান আ.-এর খেদমতে মালাকুল মাউত উপস্থিত হয়ে জানালেন যে, আপনার মৃত্যুর আর কয়েকটি মুহূর্ত বাকি আছে। তখন তিনি ভাবলেন, জিনরা যেনো নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত রেখেই চলে না যায়। ভাবনামতো তিনি সঙ্গে সঙ্গেই স্ফটিকের একটি কামরা তৈরি করলেন। তাতে কোনো দরজা রাখলেন না। নিজেকে কামরার ভেতর আবদ্ধ করে লাঠির সাহায্যে দাঁড়িয়ে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। এ অবস্থাতেই মালাকুল মাউত এসে তার কাজ পূর্ণ করলো। আনুমানিক এক বছর পর্যন্ত হযরত সুলাইমান আ. এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন আর জিনজাতিও তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। যখন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত সুলাইমানের লাঠিতে উইপোকার সৃষ্টি হয়। সেগুলো লাঠি কেটে নড়বড়ে বানিয়ে ফেলে। ফলে লাঠিটি হযরত সুলাইমান আ.-এর দেহের ভার বইতে না পেরে ভেঙ্গে যায়। হযরত সুলাইমানের নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে

পড়ে। তখন জিনরা বুঝতে পারে যে, অনেক দিন আগেই সম্রাট গত হয়েছেন। ফলে তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার ওপর প্রচণ্ড হতাশা ব্যক্ত করে।[১]

মোটকথা, এ জাতীয় অনেকগুলো রেওয়ায়েত ইসরাইলি সাহিত্য থেকে আহরিত হয়ে তাফসিরের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো নকল করার মুহাককিকগণ জানিয়ে দিয়েছেন, এগুলোর বাস্তবতা কী? তাওরাতে হযরত সুলাইমান আ.-এর ইন্তিকালের ঘটনা এভাবে এসেছে—

'মোদ্দাকথা, জেরুজালেমে গোটা ইসরাইলিদের ওপর হযরত সুলাইমানের মোট রাজত্বকাল হচ্ছে ৪০ বছর। সুলাইমান তাঁর বাবা-দাদাদের সঙ্গে শায়িত হন। তাঁকে তার পিতৃপুরুষদের শহর 'সায়হুন'-এ সমাহিত করা হয়। তাঁর ছেলে 'রাজআম' তাঁর স্থলে বাদশাহ হন।[২]

কাযি বায়যাবি নকল করেছেন যে, হযরত দাউদ আ.-এর ইন্তিকালের পর হযরত সুলাইমান আ. মাত্র তেরো বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৩]

বায়যাবির বক্তব্য সম্ভবত তাওরাত থেকেই সংগৃহীত।

শিক্ষা ও উপদেশ

হযরত সুলাইমান আ.-এর ঘটনাবলি পবিত্র কুরআনে যেভাবে বিশ্লেষিত ও বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে চক্ষুষ্মানদের জন্য রয়েছে অসংখ্য শিক্ষা ও উপদেশ। উল্লিখিত ঘটনাবলি চক্ষুর সামনে উন্মোচিত করে দেয় অসংখ্য সত্য। তা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি শিক্ষা ও উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১. আমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মত আল্লাহর সত্য ধর্মে নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুগমন করে যে বিকৃতিগুলো সাধন করেছে, তার মধ্য হতে একটি লজ্জাজনক বিকৃতি তারা ঘটিয়েছে আল্লাহর মহান নবী-রাসূলদের ওপর মিথ্যাচারের মাধ্যমে। তারা উচ্চ মর্যাদাশীল মহামানবদের পবিত্র জীবনীর ওপর নানাভাবে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে কয়েক কদম আগে রয়েছে বনি ইসরাইল। তারা একদিকে আল্লাহর

---

[১]. তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/৫২৯-৫৩০

[২]. সালাতিন : ১. অধ্যায় : ১১, আয়াত : ৪২-৪৩

[৩]. সূরা সাবার তাফসির

এক নির্বাচিত বান্দাকে নবী ও রাসুল বলে স্বীকারও করে, অপরদিকে অবলীলায় তাদের চরিত্রের ওপর কালেমা লেপনের অপচেষ্টা চালায়। যেমনটি আমরা ঘটতে দেখেছি হযরত লুত আ. ও তাঁর কন্যাদের ক্ষেত্রে। কখনো কখনো বনি ইসরাইল আল্লাহর নির্বাচিত নবী-রাসুলদের নবুয়ত ও রেসালাতকে অস্বীকার করে বসে। শুধু তাই নয়, বরং তাঁদের দিকে মিথ্যা অপবাদ ও অসত্য কথা জুড়ে দিতে তারা একটুও ভীত হয় না। এটিকে তারা গর্বের কাজ মনে করে। যেমনটি আমরা ঘটতে দেখেছি হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ.-এর ক্ষেত্রে।

কুরআনুল কারিম যেভাবে কোন ধর্ম সত্য ও কোন ধর্ম মিথ্যা? তা ঘোষণা করেছে এবং সত্য ধর্ম ইসলামের ওপর জ্বলজ্বলে আলো ফেলেছে, ঠিক মানবজাতির ওপর অপরীসিম অনুগ্রহ করে অতীতের সেই মহান নবী ও রাসুলদের ওপর থেকে মিথ্যাচারের ওই জঞ্জালও সরিয়ে দিয়েছে, যা শত বছরের চেষ্টায় বনি ইসরাইলিরা তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস করেছিলো। কুরআন তাঁদের পূতঃপবিত্র জীবনীর ওপর থেকে তাবৎ কালিমা দূর করে দিয়েছে। শত বছরের ধুলোর আস্তরণের নিচে চাপা পড়া সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে সত্যের স্বচ্ছ জলে বিধৌত করে উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করেছে।

২। ইতিহাসের অনেক বড় শিক্ষা হলো, বনি ইসরাইল যে গুমরাহিকে গ্রহণ করেছিলো এবং পবিত্র কুরআন উজ্জ্বল ও স্পষ্ট দলিলের মাধ্যমে যাকে প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলো; আফসোসের বিষয় হলো, সেই গুমরাহি থেকে আমাদের আঁচলও বাঁচতে পারে নি। কালের পরিক্রমায় পবিত্র কুরআনের পরিষ্কার ও আলোকিত পথ ছেড়ে আমরাও বনি ইসরাইলের সেই বিকৃত মিথ্যাচারপূর্ণ রেওয়ায়েতগুলোকে আমাদের ইসলামি রেওয়ায়েতে স্থান দিতে শুরু করেছি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন, 'আহলে কিতাবের সেসব বর্ণনা কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে যাবে না, সেগুলোকে নকল করা জায়েয আছে।' কিন্তু আমরা সেই হাদিসের বুনিয়াদি শর্ত 'কুরআন ও ইসলামি শিক্ষার বিরুদ্ধে যাবে না'-কে বেমালুম ভুলে গিয়ে যেকোনো ধরনের ইসরাইলি রেওয়ায়েতকে শুধু নকল-ই করি নি, বরং কুরআনুল কারিমের তাফসির ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেগুলোকে দলিল পর্যন্ত বানিয়েছি এবং বিভিন্ন স্থানে কুরআনের তাফসির হিসেবে

সেগুলোকে উপস্থাপন করতে শুরু করেছি। যার পরিণতি দাঁড়িয়েছে যে, একদিকে অমুসলিমরা এগুলোকে ইসলামি রেওয়ায়েত হিসেবে প্রকাশ করেছে এবং সেগুলোর ওপর রং চড়িয়ে ইসলামের নিষ্কলুষ পবিত্র শিক্ষার ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। তারা তাদের নাপাক ইচ্ছে পূরণের জন্য এগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে খোদ মুসলমানদের মধ্যে যারা দীনদ্রোহিতার পতাকাবাহক, তারা এ জাতীয় রেওয়ায়েতগুলোর ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে প্রমাণিত, ওহির মতো বিশ্বস্ত জ্ঞানের সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধর্মীয় বুনিয়াদি বিষয় যেমন, মুজেযা, হাশর ও পুনরুত্থানের ঘটনাবলি, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণকে অস্বীকার করার পথ বানিয়ে নিয়েছে। এ জাতীয় স্থান এলেই তারা বিনা-সূত্রে বলতে শুরু করে যে, এটিতো আমাদের মুফাসসিরদের অভ্যাস অনুযায়ী ইসরাইলি রেওয়ায়েত হতে সংগৃহীত। অথচ এগুলোর ক্ষেত্রে খোদ পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের অকাট্য ঘোষণা (নসসে কতয়ি) বিদ্যমান।

স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলবি মুহাম্মদ হাসান আমরোহি, মৌলবি চেরাগ আলি, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও মুহাম্মদ আলি লাহোরি প্রমুখের প্রদত্ত কুরআনের তাফসির এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর বুনিয়াদ ধর্মদ্রোহিতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

মোটকথা, উল্লিখিত দুটি পথই ভুল। ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী ইসরাইলি রেওয়ায়েতগুলোকে ইসলামি রেওয়ায়েতের ভুবনে বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের তাফসিরে স্থান দেওয়া যেমন ভুল ও চরম বিপদজনক পদক্ষেপ –চাই এটি যত নেক নিয়তে-ই করা হোক না কেনো– তদ্রূপ ধর্মদ্রোহিতাকে আহ্বান জানানোর জন্য এ জাতীয় রেওয়ায়েতের নকল করাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কুরআন ও হাদিসের পরিষ্কার নসকে অস্বীকার করা অথবা তাফসিরের নামে অর্থগত বিকৃতির পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থ হলো, ইসলামি শিক্ষাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করা এবং তার চেহারা-সুরতকে বদলে ফেলার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠা।

সঠিক ও সরল পথ সেটাই, যা মুহাককিক উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। তা হলো, একদিকে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্যের ওপর ঈমান রাখা এবং এক্ষেত্রে ধর্মবিরোধী ব্যাখ্যা করাকে দীনের বিকৃতি মনে করা। অন্যদিকে কুরআন ও হাদিসের আঁচলকে ইসরাইলি সাহিত্য থেকে পবিত্র প্রমাণিত করে সত্যের আলোকে সবার সামনে তুলে ধরা।

৩. রাজত্বের অধিকারী নবী-রাসুল আর দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের জীবনে সবসময় স্পষ্ট পার্থক্য থাকে এবং থেকেছে। নবীদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ভয়, তাঁর শাস্তির আশঙ্কা, ন্যায় ও সুবিচার, দীনের প্রতি দাওয়াত ও নসিহত এবং মানবসেবার উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। তাঁরা যদিও বৈধ স্থানে শাসকসুলভ প্রতিপত্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু সেখানে কোনো ধরনের অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা ফুটে ওঠে নি; বরং এর স্থলে بغض في الله তথা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে বৈরিতার প্রকাশ ঘটতো। অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্য রাগ করতেন না, নিজের ব্যক্তিস্বার্থে ক্রোধ প্রকাশ করতেন না; বরং মহান আল্লাহর বিধান প্রয়োগের স্বার্থে হতো তাদের যাবতীয় পদক্ষেপ। তাইতো হযরত ইউসুফ, হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমুস সালামদের পূতঃপবিত্র জীবনচরিত উল্লিখিত নীতিকথার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত তথা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের জীবন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের জীবনের পরতে পরতে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি, জাতিগত বিভেদ, শ্রেণিগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী, অধীনদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি মৌলিক বিষয় হিসেবে সবসময় প্রকাশ পেয়ে এসেছে।

উদাহরণ স্বরূপ, প্রথমে ফেরাউনের এই ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য করুন, انا ربكم الاعلى (আমি-ই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু) আর এরপর হযরত সুলাইমান আ.-এর এই আহ্বানের প্রতি লক্ষ্য করুন, أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং মুসলমান হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও)। উভয়ের কথায় শাসকসুলভ কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু ফেরাউনের ঘোষণায় আল্লাহর সঙ্গে অবাধ্যতা, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অত্যাচারমূলক চাপপ্রয়োগ, সর্বোপরি খোদায়িত্ব দাবিকারী অমমিকা ও ঔদ্ধত্য ইত্যাকার বিষয়গুলোর পরিষ্কার প্রকাশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে হযরত সুলাইমানের সম্বোধনে সম্বোধিত শ্রোতৃমণ্ডলীর তুলনায় যে বড়ত্বের প্রকাশ ঘটেছে, সেটি কোনো ব্যক্তিগত প্রতিপত্ত্বি ও নিজস্ব শ্রেষ্টত্ব প্রকাশের জন্য ঘটে নি। বরং এক আল্লাহর ঘোষণা ও তার প্রচার, আল্লাহর পতাকাকে সমুন্নত রাখা, শিরকি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠ তাওহিদের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এটাই সেই পার্থক্য, যা হযরত আম্বিয়া আ.-এর উত্তরাধিকার হিসেবে সর্বদা সত্যপন্থী খলিফা ও দুনিয়াবি শাসকবর্গের মাঝখানে পরিষ্কার পার্থক্য হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়।

৪. যে ব্যক্তির জীবন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হয়, আল্লাহ তাআলাও গোটা জগৎকে তার অনুগত ও বশীভূত করে দেন। তার প্রকাশ ঘটে এভাবে যে, তার কোনো পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে যায় না। এখন যদি সে ধরনের ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে দেখায়, যা সাধারণ পার্থিব উপকরণ ও কার্যকারণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হয়, তাহলে তা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ও বুঝার দুঃসাহস দেখানো যাবে না। কেননা, যে ব্যক্তির হাতে সেই কাজগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তিনি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন। আত্মোৎসর্গ করে ফেলেছেন। যার কারণে তার মাথার ওপর আল্লাহর স্বাধীন কুদরতি হাত এসে পড়েছে। কাজেই তাঁদের কর্মকাণ্ড (মুজেযা)-কে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের দাড়িপাল্লায় মেপে সেটিকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হওয়া নিঃসন্দেহে ভুল ও পথচ্যুতি। এক্ষেত্রে সহজ ও সরল সিরাতে মুস্তাকিম কোনটি? তা সর্বযুগে ইসলামি চিন্তাবিদগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে বয়ান করে গেছেন। যেমন, 'প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বিপরীত কাজ সবসময় ঘটে থাকে। কাজেই সেগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হলো, জাজ্বল্যমান জিনিসকে অস্বীকার করা। কেননা, যিনি প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়ম ও স্বাভাবিক রীতি-নীতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই এ অধিকার রাখেন যে, তিনি নিজ স্বাধীন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির স্বাভাবিক শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবেন। বরং এমনটিই বুঝে আসছে যে, সম্ভবত মুজেযা জাতীয় বিষয়াবলির জন্য তার কাছে সৃষ্টির সূচনা থেকেই এমন বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম ও কুদরতি রীতি-নীতি রয়েছে, যা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে আলাদা। যেহেতু দুনিয়াবি বিদ্যাসমূহ সেই বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে না, সেগুলোর সত্য উন্মোচন করতে সে যেহেতু অক্ষম, যার কারণে আমরা আমাদের স্বল্প বুদ্ধির প্রেক্ষাপটে এ কথা বুঝে নিই যে, এখানে অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটেছে এবং সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন ঘটেছে। অথচ আদতে তা নয়। বরং এ জাতীয় কাজগুলোও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের আদলে ঘটেছে। তবে পার্থক্য হলো, সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে ঘটে নি, বরং বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ঘটেছে। কাজেই এটিকে সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘন বলা যাবে না। আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের এই দু-ভাগের বণ্টনের বিষয়টি কেবল আল্লাহর সেসকল পবিত্র বান্দা-ই প্রত্যক্ষ করে থাকেন, যাদের

মাধ্যমে ওই বিশেষ কর্মগুলো প্রকাশিত হয়, যাদের হাত ধরে প্রাকৃতিক বিশেষ আইনের বাস্তবায়ন ঘটে। (যেমন, মুজেযা ও কারামাত)

৫। অন্যতম শয়তানি কুমন্ত্রণা ও প্রভাব হলো, স্বামী-স্ত্রীর সুখময় সম্পর্কে ঘৃণা ও বৈরিতার এমন বিষ মিলিয়ে দেওয়া, যা পরবর্তীকালে তাদের মাঝে চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটি হলো সবচেয়ে খারাপ কাজ। কেননা, বরাবরই এর পরিণাম হিসেবে মিথ্যা ও অপবাদ, খারাপ কথা, মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে হত্যার মতো জঘন্য কাণ্ডও ঘটতে দেখা যায়। যার কারণে এ কাজটি শয়তানের কাছে খুবই প্রিয় কাজ। বিশুদ্ধ হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিদিন সকালবেলা ইবলিস পানির ওপর সিংহাসন বিছায়। এরপর সে মানবজাতিকে পথহারা করার জন্য পৃথিবীর চারপাশে তার দল-বলকে ছড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্য হতে যে যত বেশি ফেতনা ছড়াতে পারে, সে শয়তানের কাছে তত বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। ফিরে এসে প্রত্যেক শয়তান নিজ নিজ কাজের বিবরণ পেশ করে। যেমন, কেউ বলে, আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে এমনভাবে লেগে থেকেছি যে, শেষ পর্যন্ত তার মুখ দিয়ে অবান্তর কথা বের করেছি। এ জাতীয় কাজের ফিরিস্তি শুনে শয়তান খুব বেশি খুশি হয় না। কাউকে বাহ্বাও দেয় না। বরং এগুলোকে সে সাধারণ ফেতনা হিসেবে অভিহিত করে। ইতোমধ্যে সেখানে এক শয়তান উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আজ এক সংসারে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। তাদের সুখময় দাম্পত্য সম্পর্ককে তিক্ত বানিয়েছি। ইবলিস তার কথা শুনে খুব খুশি হয়। তাকে গলায় জড়িয়ে নেয়। বাহ্বা জানিয়ে বলে, নিঃসন্দেহে আজ তুমি অনেক বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছো।[১]

জিনরূপী শয়তান ও মানবরূপী শয়তান তাদের সেই যাদুকে সাধারণত এভাবে কার্যকর করে যে, তাদের মধ্যে প্রথমত ভুল বুঝাবুঝি, কুধারণা, মন্দ বাক্যালাপ ও অকৃতজ্ঞতা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে সেই অবস্থাটি ঘৃণা, বৈরিতা ও চূড়ান্ত পরিণতিতে স্বামী-স্ত্রীর চিরবিচ্ছেদ হিসেবে পরিণতি লাভ করে। মহান আল্লাহ এর থেকে আমাদের সবসময় রক্ষা করুন।

---

[১]. সহিহ মুসলিম

হযরত আইয়ুব
আলাইহিস সালাম

কুরআনে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনে হযরত আইয়ুব আ.-এর আলোচনা চারটি সুরায় এসেছে : সুরা নিসা, আনআম, আম্বিয়া ও সাদ। সুরা নিসা ও আনআমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের তালিকায় শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ

'আর স্মরণ করুন ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানকে।' [সুরা নিসা]

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

'এবং তার বংশধরদের মধ্য হতে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে।' [সুরা আনআম]

আর সুরা আম্বিয়া ও সাদে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। সেখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, জীবনে তাকে খুবই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। চরম দুঃসময়ে তাঁর ওপর বিপদের জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিলো। কিন্তু এমন চরম প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁর মুখে ছিলো কৃতজ্ঞতার শব্দ; তিনি কখনো অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁকে নিজ রহমতের চাদরতলে ঢেকে নেন। বিপদের কুজ্ঝটিকা দূর করে দয়া ও অনুগ্রহের আঁচল ভরে দেন। এ কারণে সঙ্গত মনে হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কিত যেসব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা উপস্থাপন করার পূর্বে হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যক্তিত্বের ওপর ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করে ফেলি। যাতে যে মহান ব্যক্তিত্বের ধৈর্য ও সংযমের অকুণ্ঠ প্রশংসায় পবিত্র কুরআন সবাক হয়ে উঠেছে; ওই মহান ব্যক্তির সঠিক পরিচিতি যেনো আমরা ভালোভাবে জানতে পারি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় যাঁর মহান জীবন ছিলো বরকত ও উত্তম চরিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রবাদ প্রতীম দর্পণ।

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিপরিচিতি

হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্য দুটি মাত্র উৎস রয়েছে। একটি হলো, তাওরাত। আর অপরটি হলো ওই সকল সূচয়িত

উদ্ধৃতি, যা প্রাচীন ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে আরব ঐতিহাসিকগণ ও ইসলামের ইতিহাসবেত্তাগণ নকল করেছেন। যদি এগুলোর সঙ্গে আরো কিছু বহিঃসূত্রে প্রাপ্ত আলামত সংযুক্ত করে নেয়া হয়, তাহলে বিষয়টির ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করা যাবে।

হযরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন সাক্ষ্য হলো সিফরে আইয়ুব। সহিফাটি তাওরাতের সংকলনগ্রন্থে হযরত আইয়ুব আ.-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। এতে তাঁর পবিত্র জীবন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

সিফরে আইয়ুবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে দুটি কথা রয়েছে। একটি হলো, তিনি ছিলেন 'আউদ' অঞ্চলের বাসিন্দা।

'আউদ' এলাকায় আইয়ুব নামের জনৈক ব্যক্তি ছিলেন। লোকটি ছিলেন একজন কামেল ও সত্যবাদী মানুষ। তিনি খোদাকে ভয় করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতেন।'[১]

দ্বিতীয় কথা হলো, তাঁর পালিত জন্তু ও গবাদি পশুর ওপর 'সাবা' ও 'কিসদি' সম্প্রদায় (বাবেলি)-এর লোকেরা আক্রমণ করে লুট করে নিয়েছিলো। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিলেন ওই দুই সম্প্রদায়ের উত্থানকালের সমসাময়িক লোক।

ইউবাব ও আইয়ুব

হযরত আইয়ুব আ.-এর সহিফার তথ্য দুটির ওপর আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমাদেরকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় একটি বিষয় স্পষ্ট করতে হবে। সেটি হলো, তাওরাতসহ ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে 'ইউবাব' নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। গবেষকদের ধারণা, আইয়ুব ও ইউবাব একই ব্যক্তির ভিন্ন দুটি নাম। মূলত ইবরানি ভাষায় 'ইউবাব'-কে আউব বলা হয়। সেটিই আরবিতে এসে 'আইয়ুব' হয়ে গেছে। যদি গবেষণার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আইয়ুব, ইউবাব ও আউব; একই ব্যক্তির তিন ভাষার ভিন্ন উচ্চারণ-সম্বলিত নাম, তাহলে হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়, যার সমাধান না করলে নয়। তাওরাতের বিবরণ অনুযায়ী ইউবাব নামে ইতিহাসে দু-জন আলাদা ব্যক্তি

---

[১]. অধ্যায় : ১, আয়াত : ১

রয়েছে। একজন হলেন বনি ইয়াকতানের সদস্য। আর অপরজন বনি আদওয়ামের লোক। যে ইউবাব বনি ইয়াকতানের বংশধর ছিলেন, তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এরও অনেক আগের লোক। কেননা, তার বংশপরম্পরা মাত্র পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে হযরত নুহ আ. পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এভাবে, ইউবাব বিন ইয়াকতান বিন ঈর বিন সুলাহ বিন আরফাকসাদ বিন সাম বিন নুহ[২] আ.।[৩] পক্ষান্তরে যে দ্বিতীয় ইউবাব ছিলেন বনি আদওয়াম বংশের সন্তান, তিনি যদিও হযরত মুসা আ.-এরও আগের লোক, কিন্তু প্রথম ইউবাবের তুলনায় তিনি ছিলেন আরো অনেক পরের লোক। এ কারণে হযরত ইসহাক আ.-এর আলোচনা এ কথা এসেছে যে, আদওয়াম হলো হযরত ইসহাক আ.-এর ছেলে ইসুর উপাধি। তিনি হযরত ইয়াকুব আ.-এর বড় ছিলেন। কিনআন থেকে হিজরত করে আপন চাচা হযরত ইসমাইল আ.-এর কাছে হিজাযে চলে আসেন। তাঁরই কন্যা মাহাল্লাত[৪] অথবা বাশামাহকে বিয়ে করে আরবের সেই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন, যেটি শাম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে আরবের শেষ সীমান্ত। যেখান থেকে সায়ির পর্বতমালা শুরু হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। স্থানটির বিবরণ এভাবেও দেয়া যেতে পারে, যে স্থানটি আম্মান থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫]

সেই ইসু (আদওয়াম)-এর বংশধরদের হাতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা ছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে, তাদের শাসনকালের সূচনা আনুমানিক ১৭০০ খ্রিস্টপূর্ব সন থেকে ঘটেছে। হযরত মুসা আ.-এর যুগে যখন বনি ইসরাইল মিসর থেকে ফিরে আসছিলো, তখনও সায়ির অঞ্চলে বনি আদওয়ামের শাসন বলবৎ ছিলো। তাওরাতে এসেছে—

'তখন মুসা কাদেস হতে বনি আদওয়ামের রাজাকে দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে, তোমার ভাই ইসরাইল বলেছে, যেসমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমাদের ওপর নিপতিত হয়েছে, তা তুমি জানো। আর বনি ইসরাইলের গোটা সম্প্রদায় কাদেস হতে যাত্রা করে হুর পাহাড়ের ওপর চলে এলো।

---

২. পয়দাইশ, অধ্যায় : ১০, আয়াত : ২২-২৪

৩. আরবি উচ্চারণ হবে এভাবে, يوباب بن يقطان بن عير بن سلح بن ارفكسد بن سام بن نوح عليه السلام

৪. তাওরাত, পয়দাইশ, অধ্যায় : ২৮, আয়াত : ৯

৫. দায়েরাতুল মা'আরিফ লিল বুসতানি, খণ্ড : ২

খোদাওয়ান্দ হুর পাহাড়ের ওপর —যা বনি আদওয়ামের রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন ছিলো—মুসা ও হারুনকে বললেন... ।'[১]

বনি আদওয়ামের[২] সেই শাসকদের তালিকা তাওরাতে বিবৃত রয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, বনি ইসরাইলের ওপর সাউল (তালুত)-এর বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১০০০ সনে। যা বনি আদওয়ামের অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। সেই সাউলের পূর্বে মোট আটজন শাসক রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়জনের নাম হলো, ইউবাব বিন যারেহ (يوباب بن زارح)।

এখানে এসে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত আইয়ুব আ. ও ইউবাব একই ব্যক্তির দুটি ভিন্ন নাম হয়ে থাকে, তাহলে উল্লিখিত দুই ইউবাবের মধ্য হতে কোনজন সম্পর্কে বলা হবে যে, তিনিই হলেন হযরত আইয়ুব আ.? উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিকদের দুটি অভিমত পাওয়া যায়। মাওলানা আযাদ বলেন, যিনি বনি ইয়াকতানের বংশধর, তিনিই হযরত আইয়ুব আ.। যিনি আরবে আরিবার বংশধর। এ কারণে হযরত আইয়ুব আ. হয় হযরত ইবরাহিম আ.-এর সমসমায়িক ছিলেন অথবা তিনি ন্যূনতম হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের সমবয়সী ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

'প্রথমত তাওরাতের সিংহভাগ গবেষকের অভিমত হলো, হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন খাঁটি আরব। তিনি আরবে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। সিফরে আইয়ুব মূলত প্রাচীন আরবি ভাষায় লেখা হয়েছিলো। হযরত মুসা আ. সেটিকে প্রাচীন আরবি ভাষা থেকে ইবরানি ভাষায় রূপান্তর করেন। সিফরে আইয়ুবে এ কথা রয়েছে যে, তিনি 'আউদ' এলাকায় বসবাস করতেন। কিয়দ্দূর পরে সেখানে এ তথ্যও রয়েছে যে, তাঁর পালিত পশুদের ওপর সাবার লোকেরা আক্রমণ করেছিলো। এই দুটি উদ্ধৃতি উপরিউক্ত অভিমতকে সত্যায়ন করে। কেননা, কিতাবে পয়দায়েশ ও তাওয়ারিখে আওয়াল-এ আউদকে আরাম বিন সাম বিন নুহ-এর সন্তান বলা হয়েছে। আর আরামি সর্বসম্মতিক্রমে খাঁটি আরবদের সূচনাকালীন সম্প্রদায়ের একটি।'[৩]

---

[১]. গিনতি, অধ্যায় : ২, আয়াত : ২২-২৩

[২]. পয়দায়েশ, অধ্যায় : ৩৬, আয়াত : ৩২-৩৯

[৩]. তরজমানুল কুরআন : ২/৪৮৬

আরব ঐতিহাসিকদের মধ্য হতে ইবনে আসাকিরও একই অভিমত পোষণ করেন যে, হযরত আইয়ুব আ. হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছাকাছি সময়ের ছিলেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি হযরত লুত আ.-এর সমবয়সী ও দীনে ইবরাহিমির অনুসারী ছিলেন।[৪]

নাজ্জার মিসরি আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে এ দাবি করেছেন যে, হযরত আইয়ুব আ.-এর যুগ হযরত ইবরাহিম আ.-এর সময়কাল থেকে আরো একশো বছর আগে ছিলো।[৫]

তাঁদের দু-জনের বিপরীতে মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান বলেন, হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন বনি আদওয়াম গোত্রের বংশধর। তাঁর সময়কাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৭০০ সনের মাঝামাঝি। তিনি 'আরদুল কুরআনে' লিখেছেন—

'হযরত আইয়ুব আ. আদওয়ামি বংশের ছিলেন, এ বিষয়টি খোদ সিফরে আইয়ুব থেকে প্রমাণিত। সেখানে রয়েছে যে, 'আউদ এলাকায় একজন সৎ লোক বসবাস করতেন। যিনি ছিলেন সত্যপন্থী। আল্লাহকে ভয় পেতেন আর মন্দ কাজ এড়িয়ে চলতেন। (১০১)[৬]

তাওরাতে আউদ নামে দুই ব্যক্তি পাওয়া যায়। একজন তো খুবই প্রাচীন। আউদ বিন আরাম বিন সাম বিন নুহ। (তাকউয়িন : ২৯-২৬) সিফরে আইয়ুবে উল্লেখিত আউদ বলতে দ্বিতীয় আউদ উদ্দেশ্য; এর ওপর আহলে কিতাবগণ একমত। তিনি যে বনু আদওয়ামি আরব ছিলেন, তার ওপর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সিফরে আইয়ুবে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গীদের যে আবাসস্থলের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো, তায়মান, নি'মাতান ও শাওহান। (২-১১) প্রথম নগরী সম্পর্কে এ কথা সবাই ভালোভাবেই জানে যে, এটি হলো আদওয়াম সম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। (তাকউয়িন : ৩৫-৩৬)'

তাঁর সময়কাল সম্পর্কেও সহজেই এ ফয়সালা করে ফেলা যায় যে, 'কুলদান' (আইয়ুব : ১-১৭) এবং সাবা (আইয়ুব : ১০-১৫)-কে হযরত আইয়ুব আ.-এর সমসাময়িক বলা হয়েছে। সাবার উত্থানকাল হলো খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে

---

[৪]. ফাতহুল বারি : ২/৩৬২

[৫]. কাসাসুল আম্বিয়া : ৪১৫

[৬]. আরদুল কুরআন : ২/২৪

খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সন। কাজেই উল্লিখিত দুটি যুগের মাঝামাঝি কোনো একটি সময়কে হযরত আইয়ুব আ.-এর যুগ স্বীকার করা উচিত।'[১]

এটি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে, সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা দু-জনই সাবা ও কালদানি (বাবেলি)-এর সময়কালের সনদ পেশ করেছেন। কিন্তু পরিণতি বের করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা পরস্পর ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

সাইয়িদ সুলাইমান সাহেবের কথার সমর্থন পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইয়াকুবির মন্তব্য থেকে। তিনি লিখেছেন يوباب هو أيوب بن زارح الصديق 'ইউবাব হলেন সত্যবাদী নবী আইয়ুব; যিনি ছিলেন যারেহ-এর সন্তান।'

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হলো, ইউবাব-ই হযরত আইয়ুব আ.; এটাই সঠিক কথা। আর আমাদের কাছে এ অভিমত-ই প্রণিধান পাচ্ছে যে, তিনি ইয়াকতান গোত্রের লোক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বনি আদওয়ামের সন্তান।

হযরত আইয়ুব আ.-এর সময়কাল

তবে সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাইয়িদ সাহেবের মন্তব্য সঠিক নয়। তিনি যে বলেছেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর সময়কাল হলো খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সন থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ সনের মাঝামাঝি সময়, এটি সঠিক নয়। বরং সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এটাই যে, হযরত আইয়ুব আ.-এর সময়কাল হলো হযরত মুসা আ.-এর যুগ এবং হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের যুগের মাঝামাঝি। যাকে সন্ধান করতে হবে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সন থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে।

আমাদে সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়েছি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক আলামতের ওপর। এগুলো এতটাই সুস্পষ্ট যে, এগুলোকে 'দলিল' দাবি করলে অতিরঞ্জন হবে না।

১. প্রথম আলামত, তাওরাত গবেষকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, হযরত আইয়ুব আ.-এর সহিফাটি হযরত মুসা আ.-এরও অনেক আগের গ্রন্থ। হযরত মুসা আ. সেটিকে প্রাচীন আরবি ভাষা থেকে ইবরানি ভাষায় অনুবাদ

---

[১]. আরদুল কুরআন : ২/২৪

অপেক্ষা রাখে, কিন্তু বংশতালিকার ক্ষেত্রে তাওরাতসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি যে তথ্য দিয়েছে যে, তিনি হযরত ইউসুফ আ.-এর দৌহিত্র বা হযরত লুত আ.-এর দৌহিত্র; এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা, এটি কোনো ঘটনাক্রমে ঘটিত নয়, বরং সূত্রনির্ভর তথ্য। চতুর্থ আলামতটিও এ কথা স্পষ্ট করে দেয় যে, হযরত আইয়ুব আ.-এর যুগ হতে হবে হযরত মুসা আ.-এর পূর্বে। এবং তা হতে পারে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ সময়কালের মধ্যবর্তী সময়টি। ইমাম বুখারি রহও সম্ভবত একই অভিমত পোষণ করেন। এ কারণে তিনি কিতাবুল আম্বিয়ায় নবীদের ক্ষেত্রে যে ধারাক্রম তৈরি করেছেন, সেখানে হযরত আইয়ুব আ.-এর নাম উল্লেখ করেছেন হযরত ইউসুফ আ.-এর পরে এবং হযরত মুসা আ.-এর আগে।

ভুল বোঝাবুঝির নিরসন

হযরত আইয়ুব আ.-এর বংশতালিকার ক্ষেত্রে তাওরাত যেসব নাম বর্ণনা করেছে এবং আরব ঐতিহাসিকগণ যে সকল নাম দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে বাহ্যত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু গবেষণার পর বুঝে আসে যে, এটি কোনো বাস্তবিক পার্থক্য নয়। নামের ক্ষেত্রে এ ধরনের পার্থক্য সাধারণত বিভিন্ন ভাষার ভায়া হয়ে আসার কারণে লেখার ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাওরাতের আউদ আর আরব ঐতিহাসিকদের মাউস, এভাবে তাওরাতের যারেহ আর ঐতিহাসিকদের যাররাহ; উভয়টি এক ও অভিন্ন। তবে যেসকল ঐতিহাসিকগণ মাউস বা আমূস-কে আইয়ুব ও যাররাহ (যারেহ)-এর মাঝখানে স্থান দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। হাফেয ইবনে হাজার রহ.ও পরিষ্কার বলেছেন যে, কতিপয় লেখক হযরত আইয়ুব আ.-এর বংশতালিকা এভাবে দিয়েছেন, রাওম ইবনে আয়স। অর্থাৎ তারা তাকে রাওমের সন্তান অভিহিত করেছেন, এটি নির্ঘাত ভিত্তিহীন কথা।

ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের চোখে হযরত আইয়ুব আ.

হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যাপারে গবেষণাপ্রসূত সঠিক সিদ্ধান্ত জানানোর পর আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করা সমীচীন মনে করছি। তা হলো, হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি কাল্পনিক নাম। আইয়ুব কোনো ব্যক্তির নাম নয়। যেমন, রাব্বি হাম্মানি দিয, মিকাইলস, স্টিয়ান এই মত পোষণ করেন

এবং বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে যতগুলো ঘটনা পাওয়া যায়, তার সবগুলোই বানোয়াট ও কাল্পনিক। তাদের মতে, সিফরে আইয়ুব সহিফাটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে প্রাচীন কিন্তু সেটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক। পক্ষান্তরে কান্ট ও ইন্টেল প্রমুখর বলেন, হযরত আইয়ুব বাস্তবেই একজন ব্যক্তির নাম। তার দিকে সম্বন্ধিত সহিফাটিকে কাল্পনিক ও বানোয়াট বলাটা ভুল।[১]

তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড মতানৈক্য রয়েছে। আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিষয়টি বিতর্কিত। নিম্নের তালিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো :

ক্র.	নাম	অভিমত
১.	বুসতানি	হযরত ইবরাহিম আ. থেকে একশো বছর পূর্বে
২.	ইবনে আসাকির	হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছাকাছি সময়
৩.	কান্ট	হযরত ইয়াকুব আ.-এর সমসাময়িক
৪.	ইন্টেল	হযরত মুসা আ.-এর সমসাময়িক
৫.	তাবারি	হযরত শুয়াইব আ. পরবর্তী যুগ
৬.	'	হযরত সুলাইমান আ.-এর সমসাময়িক
৭.	ইবনে খায়সামা	হযরত সুলাইমান আ. পরবর্তী যুগ
৮.	ইবনে ইসহাক	ইসরাইলি, তবে সময়কাল অনির্ধারিত
৯.	'	বুখতেনাস্‌সারের সমসাময়িক
১০.	'	বনি ইসরাইলের কাযিদের সমসাময়িক
১১.	'	ইরানসম্রাট আর্দেশির-এর সমসাময়িক

মোটকথা, হযরত আইয়ুব আ.-এর ব্যক্তিত্বকে যখন ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা হয়, তখন নিশ্চিতভাবে যেসব তথ্য স্পষ্ট হয়—

১. হযরত আইয়ুব আ. একজন আরব। বিভিন্ন মত্যে অনৈক্য থাকলেও এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তিনি আরব বংশোদ্ভূত।

২. তাওরাতের অংশগুলোর মধ্যে সিফরে আইয়ুব সবচেয়ে প্রাচীন সহিফা। তা আরবি থেকে ইবরানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

৩. হযরত আইয়ুব আ. ছিলেন বনি আদওয়াম বংশোদ্ভূত।

৪. তাঁর সময়কাল হযরত ইয়াকুব আ. ও হযরত মুসা আ.-এর মধ্যবর্তী যুগ।

---

[১]. কাসাসুল আম্বিয়া লিন নাজ্জার : ৪১৫-৪১৬

পবিত্র কুরআনে হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনা

হযরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে উল্লেখিত বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়ার পর এখন আমরা যা সুরা আম্বিয়া ও সুরা সাদে বিবৃত তাঁর সংক্ষিপ্ত ঘটনাকে পেশ করতে চাইছি—

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ () فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ()

'এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত; আর এটা ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৩-৮৪]

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ () ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ () وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ () وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ()

'আর স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললো, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করো। এই তো গোসল করার জন্য সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো অনেক, আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও জ্ঞানীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ করো না। নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। খুবই উত্তম বান্দা সে। নিশ্চয় সে আল্লাহ-অভিমুখী।' [সুরা সাদ : আয়াত ৪১-৪৪]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনা যদিও খুবই সংক্ষেপে ও সরলভাবে বয়ান করা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য ও বোধের ভিত্তিতে তাঁর

করিয়েছেন। তারা একথাও স্বীকার করেছেন যে, তাওরাতের সবকটি সহিফার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সিফরে আইয়ুব।

২. যেসকল ঐতিহাসিক হযরত আইয়ুব আ.-কে বনি আদম বংশোদ্ভূত বলেছেন, তারাও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আদওয়াম (ইসু বা ঈস) ও তাঁর মাঝে দুই স্তরের অধিক ভায়া নেই। অর্থাৎ আইয়ুব বিন যারেহ (যাররাহ) বিন মাউস (আউয) বিন ইসু।[২]

৩. সেই ঐতিহাসিকগণ যখন হযরত আইয়ুব আ.-এর বংশতালিকা উল্লেখ করে মাতৃবংশ পরম্পরায় আসেন, তখন হযরত লুত আ.-এর কন্যা থেকে শুরু করে তাঁর সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত এবং হযরত ইউসুফ আ.-এর কন্যাদের কথা উল্লেখ করে এর নিচে অবতরণ করেন না। যেমন, ইবনে আসাকির বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত লুত আ.-এর কন্যার ঘরের বংশধর। কাযি বায়যাবি লিখেছেন, তিনি লিইয়্যা বিনতে ইয়াকুব আ. অথবা মাখির বিন মিশা ইবনে ইউসুফ আ. অথবা রহমত বিনতে ইফরায়িম ইবনে ইউসুফ আ.-এর পুত্র।[৩]

৪. সাইয়িদ সাহেব আউদের যে বংশতালিকা দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করলেও হযরত আইয়ুব আ.-এর বংশপরম্পরা কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয় ব্যতিরেকে এভাবে সঠিক হয়ে যায় যে, ইউবাব (আইয়ুব) বিন যারেহ বিন আউদ বিন দায়সান বিন ইসু বিন ইসহাক আ.। এই বংশপরম্পরায় যদিও সাধারণ ঐতিহাসিকদের দেয়া বংশপরম্পরার চেয়ে শুধু একটি নামের সংযুক্তি ঘটে, তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোনো প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না যে, তাঁর সময়কাল হযরত মুসা আ.-এর যুগ পেরিয়ে আরো পেছনে চলে যায়। সময়টি তখন হয়ে যায় খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সন থেকে ৭০০ সনের মধ্যবর্তী।

উল্লিখিত আলামত ও দলিলসমূহের মধ্য হতে প্রথম আলামতটি খুবই মজবুত এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ হলো, তাওরাত গবেষকগণ ইতিহাসের আলোকেই এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত আইয়ুব আ.-এর সহিফাটি হযরত মুসা আ.-এর যুগেরও বেশ আগের গ্রন্থ। কাজেই একে আলামত না বলে শক্ত দলিল বলতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলামতদুটি যদিও নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোচনার

[২]. ফাতহুল বারি : ৬/৩৬২

[৩]. বায়দাবি, সুরা আম্বিয়া

'আর স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রভু আপনাকে সতর্ক করলেন যে, আপনি যদি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, তাহলে আমি আপনার জন্য (আমার নেয়ামত) বাড়িয়ে দেবো।'

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ () الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ () أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ()

'আর আপনি সুসংবাদ জানিয়ে দিন ধৈর্যশীলদের, যাদের ওপর কোনো বিপদ নেমে এলে তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্‌র-ই জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারা ওইসব লোক, যাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের দয়া ও রহমত রয়েছে এবং তারা-ই সরল পথপ্রাপ্ত।' [সুরা বাকারা]

হযরত ইউনুস
আলাইহিস সালাম

কুরআনে হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা

পবিত্র কুরআনের ছয়টি সুরায় হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা এসেছে : সুরা নিসা, আনআম, ইউনুস, আস সাফ্‌ফাত, আম্বিয়া ও আল কলম। এর মধ্য হতে প্রথম চারটি সুরায় শুধু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর শেষ দুই সুরায় বিশেষণসহ তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে। একটিতে এসেছে ذوالنون বিশেষণ। আর অপরটিতে এসেছে صاحب الحوت। নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো :

ক্র.	সুরার নাম	আয়াত নং	সংখ্যা
১.	নিসা	১৬৩	১
২.	আনআম	৮৭	১
৩.	ইউনুস	৯৮	১
৪.	আম্বিয়া	৮৭,৮৮	২
৫.	আস সাফ্‌ফাত	১৩৯-১৮৪	১০
৬.	আল কলম	৪৮-৫০	৩/১৮

প্রকাশ থাকে যে, সুরা নিসা ও আনআমে নবীদের তালিকায় শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি সুরাগুলোয় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস আ.-এর পবিত্র জীবনের শুধু সে দিকটিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার সঙ্গে তাঁর নবীসুলভ জীবনীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং যাতে হেদায়েতের বিভিন্ন বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের আহ্বান জানায়।

হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা

পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও ঘটনার বিবরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট; কিন্তু কয়েকটি তাফসিরি আলোচনা তার বেশ কিছু ছোট-খাট বিষয়কে চরম মতভেদপূর্ণ বানিয়ে ফেলেছে। এ কারণে সঙ্গত মনে করছি যে, প্রথমে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিয়ে দেবো। এরপর

তাফসিরি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো। যাতে ঘটনার মূল বাস্তবতা বুঝতে সহায়ক হয়।[১]

হযরত ইউনুস আ. মাত্র ২৮ বছর বয়সেই নবুয়ত লাভ করেন। 'নিনাওয়া' অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য তাঁকে আদেশ দেয়া হয়। হযরত ইউনুস আ. দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে দীনের তাবলিগ ও তাওহিদের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে নি। গোয়ার্তুমি ও অবাধ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে শিরক ও কুফরির ওপর অবিচল থাকে। তারা তাদের পূর্বের অবাধ্য জাতি-গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আল্লাহর এই মহান সত্য নবীর সমস্ত আহ্বান উপেক্ষা করে যেতে থাকে। তারা তাকে নিয়ে পথে-ঘাটে বিদ্রূপ করতে থাকে। জাতির এহেন ধারাবাহিক অবাধ্যতা ও বৈরিতার কারণে হযরত ইউনুস আ. ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে বদদোয়া করে রাগ করে তাদের ছেড়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন।

তিনি যখন ফোরাতের[২] তীরে এসে হাজির হন, তখন দেখতে পান যে, একটি নৌকা যাত্রীদের বহন করে এখনই যাত্রা শুরু করবে। হযরত ইউনুস আ. নৌকায় চড়ে বসলেন। নোঙ্গর তুলে নৌকাটি রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু নৌকার ওপর আছড়ে পড়তে শুরু করলো। ফলে সেটি দুলতে শুরু করলো। যাত্রীদের মধ্যে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। তখন তারা তাদের সনাতন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বললো, 'মনে হচ্ছে, আমাদের নৌকায় চড়ে কোনো গোলাম তার মনিব থেকে পালাচ্ছে। কাজেই তাকে নৌকা থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত মুক্তির আশা নেই।'

হযরত ইউনুস আ. তাদের কথা শোনামাত্রই সচকিত হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওহির অপেক্ষা না করে আমার নিনাওয়া থেকে এভাবে চলে আসা মহান আল্লাহর মনঃপূত হয় নি। এটি আমার পরীক্ষার লক্ষণ। ভাবনাটি মনে জেগে উঠতেই তিনি নৌকাবাসীদের বললেন, 'আমি-ই ওই পলায়নপর গোলাম। আমি-ই আমার মনিব থেকে পালাচ্ছি। কাজেই তোমরা আমাকে নৌকা থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলো।' সেই নৌকার মাঝি-মাল্লা ও আরোহীরা হযরত ইউনুস আ.-কে পূর্ব থেকেই জানতো। এ কারণে তারা তাঁর কথামতো কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালো। তারা পরস্পরে সিদ্ধান্ত

---

[১]. রুহুল মা'আনি, সুরা ইউনুস ওয়াস সোফফাত

[২]. রুহুল মা'আনি

নিলো যে, লটারি হবে। তিনবার লটারি করা হলো আর প্রতিবারই হযরত ইউনুস আ.-এর নাম লটারিতে উঠে এলো। তখন তারা বাধ্য হয়ে হযরত ইউনুস আ.-কে নদীবক্ষে ফেলে দিলো। অথবা তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেসময় মহান আল্লাহর নির্দেশে একটি মাছ তাকে গিলে ফেললো। মাছটির প্রতি নির্দেশ ছিলো, শুধু গিলে ফেলার অনুমতি রয়েছে। ইউনুস তোমার খাদ্য নয়। তাঁর দেহে বিন্দু আঁচড়ও দেয়া যাবে না।

হযরত ইউনুস আ. যখন নিজেকে মাছের দেহে জীবন্ত আবিষ্কার করলেন, তখন মহান আল্লাহর দরবারে নিজের অনুতাপ প্রকাশ করলেন যে, কেনো যে আমি ওহির অপেক্ষা না করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমার উম্মত থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে নিনাওয়া ত্যাগ করে চলে এসেছি। তিনি নিজের ওই অপূর্ণতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এ দোয়া বলতে লাগলেন— لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 'হে প্রভু, তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করে ফেলেছি।'

মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস আ.-এর দরদমাখা মিনতি কবুল করলেন। তিনি মাছটিকে নির্দেশ করলেন, 'তোমার কাছে আমার যে আমানত রয়েছে তা উগরে ফেলো'। মাছটি নদীর তীরে এসে হযরত ইউনুস আ.-কে উগরে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পাখির ডিম ফুটে যখন ছানা বের হয় তখন সদ্যপ্রসূত ছানাটি যেমন পশমহীন কোমল তুলতুলে দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসে, মাছের পেটে থাকার কারণে হযরত ইউনুস আ.-এর দেহখানা ঠিক তেমন হয়ে গেলো। প্রচণ্ড দুর্বল ও নিশ্চল অবস্থায় তাকে শুষ্ক মাটিতে ফেলা হলো। তখন আল্লাহর নির্দেশে তার জন্য একটি লতা-গুল্ম বিশিষ্ট গাছ গজিয়ে উঠলো। তার ছায়ায় একটি ঝুপড়ি বানিয়ে তিনি সেখানে বাস করতে লাগলেন। কয়েকদিন পর একটি কাণ্ড ঘটলো। আল্লাহরই নির্দেশে সেই লতার গোড়ায় পোকা জন্মাতে শুরু করলো। কয়েকদিন না যেতেই সে পোকাগুলো লতার গোড়া কেটে ফেললো। ফলে লতা-গুল্ম শুকিয়ে গেলো। হযরত ইউনুস আ. এতে খুবই মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করে বললেন, ইউনুস, তুমি এই লতা-পাতা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কষ্ট পেয়েছো? অথচ এটি তো খুবই ছোট্ট জিনিস। কিন্তু তুমি কেনো ভেবে দেখলে না যে, নিনাওয়ার মতো একটি

বিশাল জনপদ; যেখানে লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে। এছাড়া সেখানে প্রচুর সংখ্যক জীব-জন্তুও রয়েছে। তা হালাক ও বরবাদ করতে আমার কি আমার খারাপ লাগতো না? এই লতা-গুল্মের ওপর তোমার যে পরিমাণ মায়া লাগছে, আমি কি ওদের ওপর এরচেয়ে বেশি দয়াপ্রবণ নই? তাহলে কিভাবে ওহির অপেক্ষা না করে জাতির ওপর বদদোয়া করে তাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলে? একজন নবীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে, সে তার জাতির জন্য আযাবের দোয়া করবে এবং ঘৃণাভরে তাদের থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে, আমার ওহির অপেক্ষা করবে না।

অন্যদিকে নিনাওয়া এলাকায় ঘটে গেলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। হযরত ইউনুস আ. তাদের ওপর বদদোয়া করে চলে গেলে সেই বদদোয়ার কিছু লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো, তখন নিনাওয়াবাসী খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, হযরত ইউনুস আ. এলাকায় নেই। এতে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মালো যে, তিনি সত্যই নবী ছিলেন। এখন আমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। একারণেই তো তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কথাটি ভাবতেই তাদের রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত ভয়ে-ত্রাসে কাঁপতে লাগলো। তারা ইসলামের বাইআত নেয়ার জন্য চতুর্দিকে হযরত ইউনুস আ.-কে খুঁজতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মহান আল্লাহর দরবারে তওবা-ইসতিগফার শুরু করে দিলো। সবধরনের গুনাহের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে জনপদের বাইরে বিশাল এক ময়দানে বেরিয়ে এলো। এমনকি চতুষ্পদ মূক জন্তুগুলোকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলো। ছোট ছোট শিশুদেরকে তাদের মায়েদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। চারপাশে কান্না ও হাহাকারের রোল পড়ে গেলো। দুনিয়া থেকে সবধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে একসঙ্গে মাওলার দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগলো। তারা চোখের জল ফেলে বলছিলো, ربنا آمنا بما جاء به يونس 'হে আমাদের পরওয়ারদিগার, নবী ইউনুস তোমার যে বার্তা আমাদের উদ্দেশে নিয়ে এসেছেন, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। এখন সেটিকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।'

অবশেষে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তাদেরকে ঈমানের দৌলত দান করলেন। এভাবে তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেলো।

মোটকথা, হযরত ইউনুস আ.-এর উদ্দেশে নির্দেশ এলো, আপনি পুনরায় নিনাওয়ায় ফিরে যান। আপনি আপনার জাতির মাঝে অবস্থান করে তাদের

পথ দেখান। যাতে আল্লাহর এত এত বান্দা তাঁর রহমতের ফয়েয থেকে বঞ্চিত না হয়। হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর সেই নির্দেশ পালন করলেন। ফিরে এলেন মাতৃভূমি নিনাওয়ায়। এলাকাবাসী তাঁকে নিজেদের মধ্যে ফেরত পেয়ে খুবই উল্লসিত হলো। তারা তাঁর আনুগত্য মেনে নিলো। এভাবে তারা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দীন-দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ অর্জনে নিমগ্ন হলো।

এটি হলো মূল ঘটনার প্রকৃত বিন্যাস। এতে পবিত্র কুরআনের আলোচনাসমূহের বিন্যাসে বাইরের কোনো ব্যাখ্যা গুজে দেয়া হয় নি। বিভিন্ন সুরায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আয়াতগুলোকে একত্র করলে মূল ঘটনা যা দাঁড়ায় সেটিকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিজের পক্ষ থেকে তথ্য সংযোজন করে গোজামিল দেয়ার চেষ্টা করা হয় নি। এ বাস্তবতা তখনই ভালোকরে বুঝে আসবে, যখন ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কমুখর আলোচনা সামনে আসবে আর এরপর উল্লিখিত বিশদ বিবরণকে তার সঙ্গে তুলনা করা হবে। কাজেই সবকিছুর পূর্বে ঘটনার সম্পর্কিত সকল আয়াত অধ্যয়ন করে নেয়া অত্যাবশ্যক মনে করছি। ইরশাদ হচ্ছে—

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

'তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেনো এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? তারা যখন বিশ্বাস করলো তখন আমি তাদেরকে পার্থিবজীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৮]

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ () فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ()

'এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করো, সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলো, অতঃপর মনে করেছিলো যে, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবো না। অতঃপর অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলো, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই: তুমি পবিত্র মহান! আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭-৮৮]

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ () إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ () فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ () فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ () فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ () لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ () فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ () وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ () وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ () فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ()

'আর ইউনুসও ছিলো রাসুলদের একজন। স্মরণ করো, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে পৌঁছলো। অতঃপর সে লটারিতে যোগদান করে পরাজিত হলো। পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেললো। তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো, তা হলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার উদরেই থাকতে হতো। অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিলো রুগ্‌ণ। পরে আমি তার ওপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম। তাকে আমি লক্ষ বা ততধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। এবং তারা ঈমান এনেছিলো; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' [সুরা সাফ্‌ফাত : ১৩৯-১৪৮]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ () لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ () فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ()

'অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; আপনি মৎস্য-সহচরের মতো অধৈর্য হবেন না, সে বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিলো। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।' [সুরা আল কলম : ৪৮-৫০]

বংশপরিচিতি

ইসলামি ঐতিহাসিকগণ ও আহলে কিতাব (ইহুদি ও নাসারা) এ-বিষয়ে একমত যে, হযরত ইউনুস আ.-এর বংশপরিচয় সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণিত হয় নি যে, তাঁর পিতার নাম মাত্তা। কেউ কেউ বলেন, 'মাত্তা' হযরত ইউনুস আ.-এর মায়ের নাম। এটি একটি চরম ভুল কথা। কেননা, বুখারি শরিফের একটি বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে

স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, 'মাত্তা' তাঁর পিতার নাম।[১] আহলে কিতাবগণ হযরত ইউনুস আ.-এর নাম 'ইউনাহ' ও তাঁর পিতার নাম 'আমতা' বলে থাকে। আমাদের পর্যবেক্ষণে ইউনুস বিন মাত্তা আর ইউনাহ বিন আমতার মধ্যে দৃশ্যমান কোনো পার্থক্য নেই। এটি মূলত আরবি ও ইবরানি ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য।

সময়কাল

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইতিহাসের আলোকে হযরত ইউনুস আ.-এর সময়কাল নির্ধারণ করা খুব কঠিন। অবশ্য কতিপয় ঐতিহাসিক বলেন, যখন ইরান (পারস্য)-এ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খল রাজত্বের যুগ চলছিলো সেসময় নিনাওয়া অঞ্চলে হযরত ইউনুস আ.-এর আবির্ভাব ঘটে।[২]

আধুনিক গবেষকগণ পারস্যশাসনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে থাকেন। একটি হলো, আলেকজান্ডারের আক্রমণের পূর্বযুগ। দ্বিতীয়টি হলো, পারথবি শাসনকার অর্থাৎ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার যুগ। আর তৃতীয়টি হলো, সাসানি শাসনামল।

প্রথমপর্বটিকে তাদের উত্থান যুগ মনে করা হয়। এটির সূচনা ঘটেছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সন থেকে। যা আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২ সনে অর্থাৎ দুই শতাব্দীর মাথায় এসে শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২ সন থেকে শুরু হয়ে ১৫০ ঈসাব্দে এসে শেষ হয়েছে। এটিকেই 'বিদ্রোহ ও বিশঙ্খলার যুগ' বলা হয়ে থাকে।[৩] এরপর থেকে শুরু হয়েছে সাসানি শাসনামল।

উল্লিখিত তথ্যের প্রেক্ষিতে হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর বর্ণনা অনুসারে হযরত ইউনুস আ.-এর যুগ খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২ থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আ.-এর জন্মের মধ্যবর্তী সময়কালে হওয়া উচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত কথাটি ভুল প্রমাণিত হয়। কারণ, ঐতিহাসিকগণ এর ওপর একমত যে, আশুরিদের এই বিখ্যাত নগরী (নিনাওয়া) বাবেলিদের হাতে খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সনে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিলো। এছাড়াও আহলে

---

১. বুখারি শরিফ, কিতাবুল আম্বিয়া

২. ফাতহুল বারি : ৬/৪৫০

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ২/১৮৩; এ যুগটি ইরদুশির বিন বাবকান-এ এসে শেষ হয়েছে। ইরদুশির হলেন প্রথম সাসানি রাজ।

কিতাবদের বিভিন্ন রেওয়ায়েত এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, হযরত ইউনুস আ.-এর যুগ শেষে খ্রিস্টপূর্ব ৬৯০ সনে যখন নিনাওয়াবাসী দ্বিতীয়বার কুফর-শিরকি ও জুলুম-অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিলো এবং তাদের অবাধ্যতার প্রকোপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিলো তখন একজন ইসরাইলি নবী –যার নাম নাহুম– তাদেরকে পুনরায় বুঝিয়ে-শুনিয়ে হেদায়েতের দাওয়াত প্রদান করেন। যখন নিনাওয়াবাসী তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না তখন তিনি তাদেরকে ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এর ৭০ বছর খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সনে নিনাওয়া এলাকা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিলো। কাজেই হযরত ইউনুস আ.-এর যুগ অবশ্যই খ্রিস্টপূর্ব ৬৯০ সন থেকেও পুরোনো হতে হবে। সম্ভবত শাহ আবদুল কাদির রহ.-এর এ অভিমতটি সঠিক যে, হযরত ইউনুস আ. হযরত হিযকিল আ.-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি লিখেছেন

'তিনি হিযকিলের অন্যতম সুহৃদ ছিলেন। হযরত ইউনুস আ. প্রচণ্ড উদ্দীপনা সহকারে ইবাদত করতেন। দুনিয়া থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতেন। অবশেষে নির্দেশ হলো, আপনাকে নিনাওয়া শহরের উদ্দেশে পাঠানো হলো। সেখানকার লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বারণ করতে হবে।'[১]

কিন্তু এখানে হিযকিল নামের ক্ষেত্রে আরব ঐতিহাসিকগণ ভুলের শিকার হয়েছেন। তারা মনে করেছেন, তিনি হলেন, হিযকিল বাদশাহ। অথচ বনি ইসরাইলে এ নামে কোনো বাদশাহ অতিক্রান্ত হন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন প্রখ্যাত নবী হযরত হিযকিল আ.।

এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট হলো যে, হযরত ইউনুস আ. ছিলেন একজন ইসরাইলি নবী। ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল আম্বিয়ায় নবীদের আলোচনা করার সময় তাঁর অনুসন্ধান অনুসারে যে ক্রমবিন্যাস তৈরি করেছেন, সেখানে তিনি হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা এনেছেন হযরত মুসা ও শুয়াইব আলাইহিমাস সালাম এবং হযরত দাউদ আ.-এর মাঝখানে।

দাওয়াতের স্থান

ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত জনপদ হচ্ছে নিনাওয়া। সেই এলাকার লোকদের হেদায়েতের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিলো। নিনাওয়া হচ্ছে আশুরি প্রশাসনের জায়গীরভুক্ত ও মূসেল অঞ্চলের কেন্দ্রীয় নগরী।

---

১. মূদিহুল কুরআন, সুরা আম্বিয়া

যে যুগে হযরত ইউনুস আ. নিনাওয়া অধিবাসীদের হেদায়েতের উদ্দেশে প্রেরিত হন, সে সময়টি ছিলো আশুরি রাজত্বের উত্থানকাল। কিন্তু তাদের শাসনপদ্ধতি ছিলো গোত্রভিত্তিক। প্রতিটি গোত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাসক ও রাজা হতো। সেই গোত্র শাসিত প্রশাসনগুলোর জায়গিরসমূহে নিনাওয়ার অবস্থান ছিলো কেন্দ্রীয় নগরী হিসেবে। এ কারণে তার উত্থান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো।

পবিত্র কুরআনে নিনাওয়ার লোকসংখ্যা এক লাখেরও বেশি বলা হয়েছে। ইমাম তিরমিযি রহ. গরিব সনদে একটি মারফু হাদিস নকল করেছেন যে, সেই এলাকায় এক লক্ষ বিশ হাজার জনগণের বসতি ছিলো। তাওরাত-সমষ্টিতে যে সহিফাটির নামকরণ করা হয়েছে হযরত ইউনুস আ.-এর নামে; তাতেও এই সংখ্যাই বলা হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রা. সাঈদ বিন যুবায়ের ও মাকহুল প্রমুখ থেকে أَوْ يَزِيْدُوْنَ এর তাফসির ১০ হাজার থেকে ৭০ হাজার পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। আমাদের মতে প্রথম অভিমতটিই প্রাধান্য পাবে।

তাফসির সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

১। সুরা আম্বিয়ার একটি আয়াত হচ্ছে, وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ। যার অর্থ হলো, 'মাছওয়ালার কথা স্মরণ করো, সে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলো, অতঃপর মনে করেছিলো, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবো না।'

এই আয়াতের তাফসিরে অনেকগুলো অভিমত পাওয়া যায়। একদল তাফসিরবেত্তা এর অর্থ করেছেন যে, হযরত ইউনুস আ. যখন তাঁর কওম থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান আর তাঁর যাওয়াটা হয় ওহির অপেক্ষা না করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির খোঁজখবর না নিয়ে, তখন তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর এই দ্রুততার জন্য আমি তাঁকে পরীক্ষার সংকীর্ণতায় ফেলবো না। উল্লিখিত তাফসির অনুযায়ী مُغَاضِبًا-এর সম্পর্ক হলো, জাতির সঙ্গে। আর لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ -এর অর্থ হচ্ছে, لن نضيق عليه। ضيق-এর অর্থে قدر শব্দের ব্যবহার প্রচুর। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের অভিমত। হযরত ইবনে আব্বাস, দহহাক, কাতাদাহ, হাসান রহ. প্রমুখ হতে এ তাফসির-ই বর্ণিত রয়েছে। এটাই ইবনে কাসির ও ইবনে জারির রহ.-এর কাছে প্রণিধানযোগ্য অভিমত।

এর বিপরীতে কতিপয় মুফাসসির যদিও مُغَاضِبًا-এর প্রথম তাফসিরের সঙ্গে একমত; কিন্তু لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ-এ قدر এর অর্থ করেছেন, সক্ষমতা তথা করতে পারা। তারা আয়াতের অর্থ করেছেন, ইউনুস মনে করেছিলো, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবো না। এটি আতিয়্যাহ আওফি রহ. হতে বর্ণিত। কিন্তু এই তাফসিরের ওপর আপত্তি ওঠে যে, এ ধরনের আকিদা রাখা তো কুফরি। একজন সাধারণ মুসলমান যখন এ কথা মনে করতে পারে না, তখন একজন নবী কিভাবে এ ধারণা পোষণ করতে পারেন? মুফাসসিরগণ উল্লিখিত আপত্তির উত্তর দিয়েছেন যে, নবী-রাসুলদের সঙ্গে মহান আল্লাহর সম্পর্ক অন্য বিশেষ লোক ও সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর বিশেষ ও সাধারণ বান্দাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মেনে নেয়া যায় বা এড়িয়ে যাওয়া যায়, সেই বিষয়টি নবী-রাসুলদের ক্ষেত্রে গ্রেফতারযোগ্য কঠিন অপরাধ হয়ে থাকে। যার কারণে যদি তাদের থেকে সামান্যতমও বিচ্যুতি ঘটে যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে ব্যক্ত করার সময় কঠিন ভাষা ব্যবহার করেন এবং এটিকে অনেক বড় অপরাধ হিসেবে প্রকাশ করেন। যাতে তিনি এ কথা বুঝতে সক্ষম হন যে, মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা ও অবস্থান এতটাই উঁচুতে যে, সাধারণ থেকে অতি সাধারণ বিচ্যুতিও তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরাধসূচক ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ এমন কিছু কথাও জানিয়ে দেন, যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, যদিও আল্লাহর নিকট তাদের উল্লিখিত কাজটি ছিলো একটি অপরাধ; কিন্তু এর কারণে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে সামান্যতম আঁচড়ও পড়ে নি। আর যেহেতু নবীগণ ওই বিশেষ কাজটি ঘটামাত্র-ই সতর্ক হয়ে যেতেন এবং নিজের অনুতাপ প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে ওজরখাহি করে মঞ্জুর করিয়ে নিতেন এজন্য মহান আল্লাহর নৈকট্য পূর্বের মতোই অক্ষুণ্ন থাকতো। এ জাতীয় ঘটনা হযরত আদম, নুহ, দাউদ, সুলাইমান আলাইহিমুস সালামসহ অপরাপর নবীদের জীবনে ঘটেছে, পবিত্র কুরআন তার সবাক সাক্ষী।

এখানেও উল্লিখিত বিষয়টির অবতারণা ঘটেছে। হযরত ইউনুস আ. প্রকৃতপক্ষে এমন ধারণা করেন নি। এবং তিনি তা করতেও পারেন না। কারণ, তিনি নবী ছিলেন এবং আল্লাহর ওহির পাত্র ছিলেন। কাজেই এভাবে তার চলে যাওয়াটা তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। তাই মহান

আল্লাহ তাঁর উল্লিখিত অবস্থাকে এমন কঠিন বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁর ঘটনাবলির সঙ্গে এ কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন, যে وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [আর ইউনুস ছিলো নবীদের একজন] فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ [এবং আল্লাহ তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন]। এভাবে আল্লাহ তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও স্তরগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখলেন। যেনো আগামীতে কোনো মানুষ বিভ্রান্তির শিকার না হয়। কোনো ফেতনাবাজ যেনো নবীদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ আচরণকে তার বক্রতানির্ভর আকিদার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে।

মুফাসসিরদের মধ্য হতে কারো কারো অভিমত হলো, مُغَاضِبًا-এর সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে। অর্থাৎ যখন হযরত ইউনুস আ. দেখলেন, আযাবের নির্দিষ্ট সময়ে আযাব আসছে না, তখন তিনি মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলেন যে, আল্লাহ আমাকে আমার জাতির সামনে ছোট করে দিয়েছেন। তাদের সেই ব্যাখ্যা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ হলো, হযরত ইউনুস আ. স্বজাতির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে নিনাওয়া নগরী থেকে চলে গিয়েছিলেন; এ ব্যাপারে যখন সবাই একমত তখন সেই পরিষ্কার অর্থ ছেড়ে একটি সনদহীন গল্পের ওপর নির্ভর করে এ কথা সংযুক্ত করা ঠিক হবে না যে, হযরত ইউনুস আ. নিনাওয়া জনপদ থেকে বের হয়ে কিছু দিন একটি জঙ্গলে অবস্থান করেছেন, যাতে তিনি স্বজাতির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখতে পান। এরপর যখন শয়তান একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির আকৃতি ধরে তাকে জানালো, আল্লাহর আযাব সরে গেছে। যার প্রেক্ষিতে তিনি মহান আল্লাহর ওপর মনঃক্ষুণ্ন হয়ে চলে যান। আর এরপর সেই নৌকার ঘটনা ঘটে। নিঃসন্দেহে গল্পটি বানোয়াট ও অবান্তর।

হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. এ পর্যায়ে মুদিহুল কুরআনে যে তাফসির লিখেছেন, তা উল্লেখিত তাফসিরসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মতে, مُغَاضِبًا-এর সম্পর্ক গোত্র ও আল্লাহ তাআলা উভয়ের সঙ্গে। আর হযরত ইউনুস আ.-এর মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার ঘটনা তিনবার ঘটেছে। প্রথমবার যখন তাকে নিনাওয়া যাওয়ার নির্দেশ জানিয়ে বলা হলো যে, ওই শহরের অধিবাসীগণ শিরক, কুফরি, জুলুম ও অন্যায়ের স্রোত বইয়ে দিয়েছিলো। দ্বিতীয়বার তিনি ওই জাতির মাঝে অবস্থান করে তাদেরকে দীনের কথা বুঝিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করছিলো না। ফলে তিনি

আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে অসন্তুষ্ট মন নিয়ে চলে যান। আর তৃতীয়বার যখন তিনি এ সংবাদ পেলেন যে, আযাব নেমে আসে নি। এ কারণে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে।

কিন্তু এই শেষ অংশটি আমার দৃষ্টিতে আপত্তিজনক। কারণ হলো, হযরত ইউনুস আ. জানতে পেরেছেন, তার স্বজাতির ওপর আযাব আসে নি। কিন্তু তিনি তো একথা জানতেন না যে, তাদের ওপর আযাব না আসার কারণ হলো, তারা ঈমান গ্রহণ করে ফেলেছে, তারা এখন সত্যপথে উঠে পড়েছে। বাকি থাকলো, শয়তানের সংবাদ দেয়ার বিষয়টি; এটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ শরয়ি প্রমাণ থাকার দরকার; তা নেই। কাজেই শেষ অংশটি কোনোভাবে সঠিক হতে পারে না।

হযরত শাহ সাহেব لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ-এর তাফসিরে বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করেছেন। সেটি প্রণিধানযোগ্য কি-না বা সহিহ কি-না সে আলোচনায় না গিয়ে এতটুকু অন্তত স্বীকার করতে হবে যে, তার ব্যাখ্যায় প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি লিখেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, ইউনুস মনে করেছিলো, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারবো না' এর অর্থ হলো, তিনি এমন রাগ করেছেন যে, মেহেরবানির ক্ষেত্রে আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না। অথচ আল্লাহর রাজত্বের জন্য যে কোনো কাজই সহজ।

অর্থাৎ হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর সঙ্গে অভিমানের এমন এক পথ অবলম্বন করেছেন যে, যেনো তিনি আল্লাহর প্রতি এমন অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে আর সন্তুষ্টই হবেন না। কিন্তু তিনি এই চরম সত্যটি ভুলে গেছেন যে, যখন তিনি পরীক্ষার কঠিন গ্রাসের শিকার হবেন, তখন তাকে সেই আল্লাহর দয়াই আবৃত করে নেবে। তখন তাকে সমস্ত মান-অভিমান ভুলে যেতে হবে। অনুতাপ ও তওবার সঙ্গে তিনি খুব দ্রুতই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এরপর শাহ সাহেব বলেন, যেখানে রাজত্ব ও প্রবল শক্তি থাকে, সেখানে যেকোনো কাজই সম্পন্ন করা আসান হয়ে যায়। এখানে অসম্ভব বলে কোনো ব্যাপার থাকে না।

৩। সুরা সাফ্ফাতে নিনাওয়া অধিবাসীদের ঈমান আনার ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, فَآمَنُوا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ 'তারা ঈমান এনেছিলো; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম।' [সুরা সাফ্ফাত : ১৪৮]

আর সুরা ইউনুসে সে কথার উল্লেখ এভাবে হয়েছে—

لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

তারা যখন বিশ্বাস করলো তখন আমি তাদেরকে পার্থিবজীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৮]

এই দুই আয়াতেই وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلَىٰ حِيْنٍ-এর ব্যাখ্যা কী? তার ওপর মুফাসসিরিনে কেরাম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে যুক্তিতে যতগুলো সম্ভাবন থাকতে পারে, তার সবগুলোই তারা জানিয়ে দিয়েছেন। কেউ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেনো আল্লাহর চিরন্তন বিধান এখানেও বলবৎ থাকে। বিধানটি হলো, যখন কোনো জাতির ওপর আযাবের ফয়সালা হয়, সেই ফয়সালা আর পরিবর্তিত হয় না। এসময় কেউ ঈমান আনলে সেটিও গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা, এটি তখন 'ঈমান বিল গাইব' থাকে না। তথা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনা হয় না, বরং এটি হয়ে পড়ে প্রত্যক্ষের ওপর ঈমান। যেমন, সমুদ্রবক্ষে ডুবে যাওয়ার সময় আযাবের ফেরেশতাদের দেখে ফেরাউন বলেছিলো, اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى। [আমরা মুসা ও হারুনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি]। যার কারণে তার সেই ঈমান কবুল হয় নি। কিন্তু হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ক্ষেত্রে সেই বিধানের তাৎক্ষণিক প্রয়োগ ঘটে নি। তারা যখন আল্লাহর আযাব দেখে তওবা ও অনুতাপ প্রকাশ করে আল্লাহর অভিমুখী হয়েছিলো, তখন তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দেয়া হয়। উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশে সে কথাই বলা হয়েছে—

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ

তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো জনপদবাসী কেনো এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো? [সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৮]

উল্লিখিত তাফসিরটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আলোচিত আয়াতের কোথাও এ কথার প্রমাণ নেই যে, 'হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ওপর আযান চলে এসেছিলো। তারা যখন আযাবের ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতঃপর মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধানের

বিপরীতে গিয়ে শুধু তাঁর জাতির সঙ্গেই এ আচরণ করা হয়েছে যে, তাদের প্রত্যক্ষনির্ভর ঈমান গ্রহণ করে তাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' কেননা, আয়াতে পরিষ্কার এ কথা বলা হয়েছে যে যেভাবে হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি ঈমান এনেছিলো, সেভাবে কেনো অন্যান্য জনপদের লোকেরা ঈমান আনলো না? যদি আনতো, তাহলে যেভাবে হযরত ইউনুসের জাতি আযাব থেকে বাঁচতে পেরেছিলো, সেভাবে তারাও আযাব থেকে রক্ষা পেতো। উল্লিখিত আয়াতে তো মহান আল্লাহ এ বিষয়ের ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন যে, ঈমান এনে অন্যান্য জনপদের লোকেরাও হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির মতো কেনো নিজেদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করলো না? অথচ উল্লিখিত তাফসিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরদের বিপরীতে গিয়ে এ কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য হলো, ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর জাতি ছাড়া অন্য যেসকল জাতি আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান গ্রহণ করেছে আমি তাদের ঈমান প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু ইউনুসের জাতির ওপর এ মেহেরবানি করেছি যে, তাদের প্রত্যক্ষনির্ভর ঈমান আমি মঞ্জুর করেছি। কবির ভাষায়—

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

রাস্তার এতটুকু পার্থক্যের কারণে কোথা থেকে কোথা চলে গেছে!

এখন যদি কোনো ব্যক্তি এ প্রশ্ন করে যে, হযরত ইউনুসের জাতির ওপর আল্লাহর কী বিশেষ টান ছিলো আর অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কিসের শত্রুতা ছিলো যে, ইউনুস আ.-এর জাতির যে ঈমান তিনি গ্রহণ করেছেন, তা কেনো অন্যদের বেলায় গ্রহণ করেননি? আমি জানি না, উল্লিখিত তাফসিরকারগণ তাদের এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন?

কেউ কেউ অবশ্য এ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস আ.-এর উম্মত আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান এনেছিলো; এ কারণে তাদের সেই ঈমান কেবল দুনিয়ার জন্য কবুল হয়েছিলো। যার কারণে তাদের থেকে আযাব সরিয়ে শুধু পার্থিব জীবনের জন্য সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাদের ওপর পরকালের আযাব যথারীতি বলবৎ থাকবে।

তাদের এ কথাও প্রথম কথার মতো ভুল। এটি পবিত্র কুরআনের পূর্বাপর আলোচনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ হলো, সুরা সাফ্ফাত ও সুরা ইউনুসে যে বলা হয়েছে, وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ। উল্লিখিত আয়াতের এ ব্যাখ্যা কী করে সঠিক

হবে যে, তাদের ঈমান শুধু পার্থিব জীবনের জন্য উপকার বয়ে এনেছে। পরকালে তারা কাফির-মুশরিক হিসেবেই গণ্য হবে। অথচ সুরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুসের গোত্রের বৈশিষ্ট্য ও বিগত জাতিসমূহের ঈমান না আনার নিন্দা হিসেবে উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে সাক্ষ্য বানিয়েছেন। কথাদৃষ্টে মহান আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত ইউনুসের জাতি যে কাজ করেছে, তাদেরও সে কাজ করা দরকার ছিলো। আর সুরা সাফ্ফাতে তাদের ঈমান আনাকে কোনো শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি? এছাড়া এ বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, পবিত্র কুরআন যখনই آمَنُوْا [তারা ঈমান এনেছে] বলে, তখন তার দ্বারা সেই ঈমান-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যা দুনিয়া ও আখেরাত; উভয় জাহানেই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন اَسْلَمْنَا [আমরা অনুগত হয়েছি] শব্দকে কখনো কখনো আভিধানিক অর্থেও ব্যবহার করে থাকে। যেমনটি মদীনার গ্রাম্যলোকদের বেলায় ঘটেছে। কিন্তু এর বিপরীতে آمَنُوْا আর آمَنَّا-কে কখনো 'আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ঈমান' ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোনো অর্থে পবিত্র কুরআন ব্যবহার করে নি। তবে উল্লিখিত আয়াতে হয়তো সেই অর্থে এসেছে, যা আমরা অনুবাদ করার সময় ইবনে কাসির থেকে নকল করেছি। অথবা তার দ্বারা এ উদ্দেশ্য হলো, বিগত জাতিসমূহের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যেসকল জাতি-গোষ্ঠী নবী-রাসুলদের হেদায়েত মেনে নেয় নি, তাদের সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক আচরণ করেছে, অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছে, সেই জাতিগুলো অবশেষে নবীদের বদদোয়ার ফলে হালাক হয়ে গেছে। তাদের জনপদগুলো পরবর্তী সময়ের লোকদের জন্য চরম শিক্ষণীয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যার কারণে পবিত্র কুরআন যখনই আদ, সামুদসহ হযরত সালেহ ও লুত আলাইহিমাস সালামের কওমসমূহের কথা তুলেছে তখন সবাইকে চরম শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানিয়েছে। যেনো সবাই পবিত্র কুরআন ভাষ্য সত্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ক্ষেত্রে একটি অস্পষ্টতা থেকে যায়। তা হলো, যদি নিনাওয়ার অধিবাসীগণ ঈমান এনে থাকে তাহলে আল্লাহর সেই বান্দাদের পরবর্তী বংশধরকে আজো দুনিয়ার বুকে চলতে ফিরতে দেখা যেতো। কিন্তু ইতিহাস বলে, আল্লাহর আযাবের কারণে অন্যান্য জাতিগুলো যেভাবে নির্মূল হয়ে গেছে, তদ্রূপ হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি ও তাদের

সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি নিনাওয়ার মতো একটি বিশাল এলাকা –যা ছিলো আশুরি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র– সেটি পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নির্মূল হয়ে গেছে যে, খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সনে এসে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে তাঁর সঠিক অবস্থানস্থল পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো।[১]

কাজেই পবিত্র কুরআন উল্লিখিত সংশয়ের যথোচিত উত্তর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে। যাতে সংশয়কারীদের দৃষ্টি যেনো তৎক্ষণাৎ ইতিহাসের অপর পাতায় চলে যায়। আর তা হলো, এ কথা ঠিক যে, হযরত ইউনুস আ.-এর জাতিটি তাঁর যুগে ঈমানদার, সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু তাদের জীবনের সেই বর্ণ পরবর্তীকালে ফিকে পড়েছিলো। পরবর্তী সময়ে তাদের সামষ্টিক জীবনে শিরক, কুফরি, অত্যাচার ও অবাধ্যতার ওই সকল উপাদান পুনরায় দানা বেধেছিলো; যেগুলোর প্রতিকার করতেই হযরত ইউনুস আ. প্রেরিত হয়েছিলেন। ওই কালের ইসরাইলি নবী 'নাহুম' আ. যদিও তাদেরকে বুঝানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এবার তারা বিগত জাতিসমূহের মতো অবাধ্যতা ও দ্রোহকেই আপন করে নিয়েছিলো। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে হযরত নাহুম আ. আল্লাহর ওহির আলোকে চূড়ান্ত ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের মাত্র ৭০ বছরের মাথায় আশুরি জাতির সভ্যতা ও তাদের প্রাণকেন্দ্র বাবেলিদের হাতে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যে, আজ কোথাও তার নাম-নিশানা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

কাজেই পবিত্র কুরআন একদিকে হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ঈমান নিয়ে আসার ওপর প্রশংসা করেছে, অন্যদিকে এদিকেও ইঙ্গিত করেছে যে, ওই জাতির যেসকল সদস্য নেক পথ গ্রহণ করেছিলো, আমি তাদেরকে জীবনের সকল উপকরণ উপভোগ করার অবকাশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমার আযাব থেকে পরিত্রাণ দিয়েছি। কিন্তু তাদের জীবনের সেই চিত্র চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকে নি। এমন এক দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, যখন তারা পূর্ববৎ শিরক ও জুলুমের পঙ্কিলতার শিকার হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহের মতো তাদেরকে বোঝানো সত্ত্বেও তারা বুঝে নি। ফলে মহান আল্লাহ তাদের সঙ্গে সেই আচরণ করেন, যা তার চিরন্তন নীতি তথা সুন্নাতুল্লাহ।

---

[১]. তাফসিরে তরজমানুল কুরআন, খণ্ড : ২। গ্রিক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতিতে

মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের তাফসির অনুসারে সঠিক কথা হলো, হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ওপর আযাব আসে নি। বরং তার কিছু প্রাথমিক পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছিলো। যার মধ্য হতে সবচেয়ে বড় পূর্বাভাস ছিলো, হযরত ইউনুস আ.-এর আযাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে এলাকা ত্যাগ করা। যা এলাকাবাসী তৎক্ষণাৎ ধরতে পেরেছিলো। এর পাশাপাশি আরো কিছু আলামত ও পূর্বাভাষ দেখে তারা বিশ্বাস করেছিলো, হযরত ইউনুস আ. নিঃসন্দেহে আল্লাহর মহান নবী। তার ওপর তারা তখন ঈমান এনেছিলো। عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যা হলো, যখন কোনো জাতির ওপর তাদের অবাধ্যতার কারণে আযাব আসে, তখন আখেরাতের আযাবের আগে তাদেরকে দুনিয়াতেই সেই লাঞ্ছনা ও হীনতার মুখ দেখতে হয়। হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি যখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো, ঈমান এনেছিলো তখন তো তারা দুনিয়ার সেই লাঞ্ছনা ও হীনতা থেকে বাঁচতে পেরেছিলো যা তাদের জুলুম ও শিরকির কারণে তাদের ওপর নেমে আসার উপক্রম হয়েছিলো। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তো দুনিয়ার আযাব থেকে বাঁচতে পেরেছিলো, কিন্তু আখেরাতের আযাব পূর্ববৎ বলবৎ ছিলো।

হাফেয ইবনে হাজার ও ইবনে কাসির রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ. প্রমুখ থেকে উল্লিখিত কথাই নকল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মহান সালফে সালেহিন থেকে এ তাফসিরই করে থাকেন। فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ এর তাফসির করে তিনি লিখেছেন—

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى، إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم، بعد ما عاينوا أسبابه، وخرج رسولهم من بين أظهرهم، فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به. — فتح الباري

'আর উদ্দেশ্য হলো, পূর্বের জনপদসমূহের মধ্য হতে এমন কোনো জনপদ পাওয়া যায় নি, যার অধিবাসীগণ তাদের নবীদের ওপর তেমন পূর্ণ ঈমান আনতে পেরেছিলো, যেমনটি হযরত ইউনুসের জাতি তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলো। তারা ছিলেন, নিনাওয়ার অধিবাসী। তাদের ঈমান আনার ঘটনা হলো, তারা আযাব নেমে আসার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলো। এই আযাব

নেমে আসবে; মর্মে তাদের নবী তাদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যখন তারা আযাবের প্রাথমিক আলামত দেখতে পেলো, সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ করলো যে, তাদের নবী তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তখন তারা মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে শুরু করলো। এভাবে তারা আল্লাহর আশ্রয়ের অনুসন্ধানে নিরত হয়ে পড়লো।' [ফাতহুল বারি]

তিনি وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ-এর তাফসিরে লিখেছেন—

أي إلى وقت آجالهم অর্থাৎ তারা তাদের জীবনে আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে গেলো। বাকি থাকলো, মৃত্যুর বিষয়টি; এটিতো সবার জীবনে আসে। [ফাতহুল বারি]

তিনি অন্যত্র লিখেছেন—

﴿فَآمَنُوا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ واختلف المفسرون : هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين، ....

والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. – فتح الباري

فَآمَنُوا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ এই আয়াতের তাফসিরে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো, ইহকালীন ও পরকালীন সবধরনের আযাব থেকে বেঁচে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়টি হলো, তাদের ওপর থেকে শুধু ইহকালীন আযাব সরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। পরকালীন আযাব পূর্ববৎ বহাল ছিলো। বাস্তবতা হলো, ব্যক্তির 'ঈমান' তাকে শুধু ইহকালীন আযাব থেকেই মুক্তি দেয় না, পরকালীন আযাব থেকেও রক্ষা করে। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। [ফাতহুল বারি]

হযরত শাহ সাহেব রহ. এ স্থানেও তাঁর নিজের মতো করে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাফসির প্রদান করেছেন। তবে তিনি যা বলেছেন তা চূড়ান্ত বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের পক্ষেই চলে যায়। তিনি লিখেছেন—

'অর্থাৎ দুনিয়াতে আযাব দেখার পর ঈমান আনা কোনো কাজে আসে না। কিন্তু হযরত ইউনুস আ.-এর জাতির ক্ষেত্রে সেটি উপকারী হয়েছিলো। কারণ হলো, তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের আদেশ পৌঁছেছিলো না। হযরত ইউনুসের দেশত্যাগের মাধ্যমে আযাবের একটি অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিলো। তদ্রূপ মক্কার লোকেরা মক্কা বিজয়ের দিন তাদের ওপর ইসলামি

বাহিনী হত্যা ও দখলদারিত্বের উপক্রম হয়েছিলো। কিন্তু তাদের ঈমান গ্রহণ হয়ে যায় এবং জননিরাপত্তা লাভ করে।'

ভণ্ড নবীর প্রতারণা

হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা থেকে পাঞ্জাবের ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি একটি অন্যায্য ফায়দা লুটার ফন্দি করেছে। তা হলো, যখন কাদিয়ানি তার কতিপয় বিরুদ্ধবাদীকে এ চ্যালেঞ্জ করেছিলো যে, যদি তারা এভাবে বিরোধিতা করে যায় তাহলে আল্লাহর ফয়সালা হয়ে গেছে যে, অমুক সময়ের ভেতর তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসবে। কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেলো যে, তাদের বিরোধিতার মাত্রা উপর্যপুরি বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও তাদের ওপর আযাবের লেশমাত্র নেমে আসে নি। তখন কাদিয়ানি ব্যর্থতার অপমান থেকে রক্ষা পেতে এ কথা চালিয়ে দিয়েছিলো যে, যেহেতু বিরুদ্ধবাদীরা মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে; এজন্য তাদের ওপর থেকে আযাব স্থগিত করা হয়েছে। যেভাবে হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

এটি যে একটি কূটকৌশল তা পবিত্র কুরআনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। কারণ হলো, হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি আযাব নেমে আসার পূর্বেই প্রকাশ্যে ঈমান গ্রহণ করেছিলো। তারা হযরত ইউনুস আ.-কে সত্য নবী স্বীকার করে তাঁর অনুসন্ধানে মেনে পড়েছিলো। তিনি ফিরে আসতেই তাঁর আনুগত্যকেই নিজেদের দীন স্বীকার করেছিলো। এর বিপরীতে কাদিয়ানীর বিরোধিতাকারীরা শুধু তার বিরোধিতাকেই অব্যাহত রাখে নি; উপরন্তু কাদিয়ানি মিশনের বিরুদ্ধে তাদের চেষ্টা ও প্রয়াসের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কাজেই নিজের মিথ্যে দাবির সপক্ষে হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা দিয়ে কাদিয়ানির দলিল দেওয়া এবং তার আড়ালে নিজের মিথ্যাচার ও কারচুপি লুকানো একটি নিষ্ফল প্রয়াস ও অবাস্তর যুক্তি বৈ কিছু নয়। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, কাদিয়ানির বিরোধীরা মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, তাহলে প্রশ্ন হলো, একজন ব্যক্তি যদি মনে মনে কাউকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাকে অস্বীকার করে তাহলে কি তাকে তার প্রতি ঈমানদার বলা যায়? যদি তা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে যেসকল ইহুদিদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡ [তারা আল্লাহর এই মহান নবীর

নবুয়তকে মনে মনে ঠিক ততটা বিশ্বাস করে, যতটা তারা তাদের সন্তানের নিজ ঔরসজাত হওয়াকে বিশ্বাস করে। তাহলে কোন যুক্তিকে সেই ইহুদিদেরকে মুমিন বলা যাবে না?

হযরত ইউনুস আ.-এর সততা ও মির্যা কাদিয়ানির মিথ্যাচারের মাঝখানে এই উজ্জ্বল পার্থক্য কি যথেষ্ট নয় যে, হযরত ইউনুস আ. যখন স্বজাতির কাছে ফিরে আসেন তখন তিনি যে জাতিকে আল্লাহর দুশমন, তার রাসুলের দুশমন, অবাধ্য ও অনাচারী রেখে গিয়েছিলেন, তাদেরকে একনিষ্ঠ মুমিন, একান্ত বাধ্য ও অনুগত এবং তাঁর আগমনের কারণে উল্লসিত পেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কাদিয়ানি দেখতে পেলো যে, তার চ্যালেঞ্জের পর বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কথা ও লেখনীতে এবং তাদের আমলি যিন্দেগিতে আগের চেয়ে আরো বিরোধী হয়ে গেছে। উপরন্তু তাদের মধ্য হতে অনেকেই এখনও জীবিত ও বহাল তবিয়তে আছেন। আর খোদ মির্যা কাদিয়ানি এমন রোগে আক্রান্ত হয়ে দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছে, যে রোগটি অনেক জাতির ওপর আযাব আকারে নেমে এসেছিলো। কবির ভাষায়—

ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا

রাস্তার এতটুকু পার্থক্যের কারণে কোথা থেকে কোথা চলে গেছে!

৪। সুরা আসসোফ্ফাতে এসেছে, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ () فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ। আর এর আগে এসেছে, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ। এখানে আয়াতের ধারাবাহিকতার বিন্যাসের প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, হযরত ইউনুস আ. মাছের ঘটনাটির পূর্বে নবুয়ত লাভ করেছিলেন না-কি তার পর? হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে ইবনে জারির নকল করেন, মাছের ঘটনার পর হযরত ইউনুস আ. নবুয়ত লাভ করেছিলেন। হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, তিনি ঘটনাটি ঘটার পূর্বেই নবুয়ত লাভ করেছিলেন এবং নিনাওয়াবাসীদের মধ্যে দীন প্রচার করতেই গমন করেছিলেন। হযরত বাগাবি রহ. বলেন, হযরত ইউনুস আ. মাছের ঘটনার পূর্বে নিনাওয়াবাসীদের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর মাছের ঘটনার পর তিনি অন্য একটি জাতির উদ্দেশে প্রেরিত হন। পবিত্র কুরআনে এক লাখের অতিরিক্ত বলে দ্বিতীয় যে উম্মতের সংখ্যা বর্ণনা করেছে সেটি নিনাওয়ার জনসংখ্যার মধ্যে গণ্য নয়।

বাগাবির এই কথাটির সনদ নেই। কারণ, হযরত ইউনুস আ. দুটি পৃথক জাতির উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন হয়েছিলেন বলে কোনো ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে নেই। বাকি থাকলো আয়াতের ধারাক্রমের বিন্যাসের ব্যাপারটি; এটি পবিত্র কুরআনের ভাষাগত সাহিত্য ও বাক্যালঙ্কারের ভিত্তিতে ঘটেছে। কারণ, আলোচিত আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম হযরত ইউনুস আ.-এর রিসালত ও নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর স্বজাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে দেশ ত্যাগ করে নৌকায় চড়া, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর কারণে লটারি হওয়া, পরবর্তীকালে সহি সালামতে মাছের পেট থেকে বেরিয়ে আসা এবং আল্লাহর মেহেরবানির আশ্রিত হয়ে সফলতার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, তিনি যে জাতির উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিলেন তারা গুটিকয়েক সদস্য বিশিষ্ট ছিলেন না। বরং তারা ছিলেন বিপুল সংখ্যক জনতার বিশাল একটি জনপদ। যারা সর্বশেষ সময়ে ঈমান এনেছিলেন এবং আগম্য আযাব থেকে নিজেদের জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কাজেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে ঘটনার আগ-পর যেমন ঘটে নি, তেমনি তার আলোচনার ধারাক্রমের বিন্যাসের প্রেক্ষিতে এ কথা আবশ্যক হয় না যে, যিনি তিনি অপর একটি জাতির উদ্দেশেও প্রেরিত হয়েছিলেন, যার কথা إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ-এ বলা হয়েছে। যেমনটি বাগাবি দাবি করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাছের ঘটনার আগে না পরে নবুয়ত লাভ করেছেন, সেই বিতর্কেরও যবনিকাপাত ঘটে। কাজেই এখন দ্বিমতের সুযোগ নেই। ইবনে কাসির রহ. উল্লিখিত দুই অভিমতের মধ্যে যেভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন সেটাই প্রকৃত বাস্তবতা। অর্থাৎ হযরত ইউনুস আ. মাছের ঘটনার পূর্বে নিনাওয়াবাসীদের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর যখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যান তখন মাছের ঘটনাটি ঘটে। উল্লিখিত ঘটনার কারণে সতর্ক হয়ে যখন তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে অনুতাপ সহকারে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আল্লাহর কাছে সেটি গৃহীতও হয়। তখন তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়, আপনি আপনার স্বজাতির কাছে ফিরে যান। কেননা, তারা এখন ঈমান এনেছে। কাজেই ফিরে গিয়ে তাদের পথপ্রদর্শন করুন।

ইউনাহ নবীর পুস্তিকা

ইউনাহ সহিফায় উল্লিখিত অভিমতসমূহের বাইরে ভিন্ন একটি কথা পাওয়া যায়। তা হলো, মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস আ.-কে নিনাওয়াবাসীর

হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'তিরসিস' এলাকায় পালিয়ে যান। আর সেই সফরেই মাছের ঘটনাটি ঘটে। ফলে তিনি সতর্ক হয়ে যান। এরপর তাকে নির্দেশ দেয়া হয়, নিনাওয়া ফিরে গিয়ে আপনার দায়িত্ব পালন করুন। হযরত ইউনুস আ. সেখানে ফিরে দীন প্রচার করেন। তারা স্বজাতি এবারও যখন দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন তিনি তাদের ভীতি প্রদর্শন করে বলেন, আগামী চল্লিশ দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব নামছে। আর তিনি দূরবর্তী একটি জঙ্গলে চলে যান। তখন তার স্বজাতি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। এসময় রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সবাই চটের কাপড় পরিধান করলো। মানবশিশু ও পশুশাবকগুলোকে তাদের মায়েদের থেকে পৃথক করে ফেললো। এমতবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে প্রবল কান্না ও হাহাকারের সঙ্গে তওবা-ইসতিগফার করতে লাগলো। লোকজন নানা প্রান্তে হযরত ইউনুস আ.-কে সন্ধান করতে লাগলো। অন্যদিকে হযরত ইউনুস আ. যখন জানতে পারলেন যে, চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আযাব আসেনি তখন মহান আল্লাহর প্রতি অভিমান করে দূরে বেরিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করলেন, আমি এ খেয়ালেই নিনাওয়া আসতে চাইনি এবং তিরসিস চলে গিয়েছিলাম। কেননা, আমি জানতাম, আপনি অনেক দয়ালু ও আযাবের ব্যাপারে মন্থর আপনি দয়াপ্রবণ ও করুণাময়ী। এখন আমাকে মিথ্যাবাদী হতে হয়েছে। আমাকে মৃত্যু দান করুন। কেননা, আমার বেঁচে থাকার চেয়ে এখন মৃত্যুই শ্রেয়। এখানে একটি ঝুপড়ি তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে ছায়া দিতে একটি অরণ্ডের লতা-গুল্মবিশিষ্ট গাছ উৎপন্ন করে দিলেন। গাছটি দেখে হযরত ইউনুস আ. খুবই খুশি হন। কিন্তু সূর্য যখন মধ্যাকাশ পেরিয়ে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে, তখন তার শেকড় পোকায় কেটে ফেললো। ফলে সেটি শুকিয়ে যায়। হযরত ইউনুস আ. এতে খুবই ব্যথিত হন। তখন মহান আল্লাহ বলেন, ইউনুস, তুমি একটি সামান্য অরণ্ডের গাছ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এতটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে গেলে। তাহলে আমি কেনো এত বিশাল নগরীর ওপর দয়াপ্রবণ হবো না, যার জনসংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার?

তাওরাতসমগ্রে এ গ্রন্থটি 'ইউনাহ নবীর পুস্তিকা' নামে অভিহিত। এতে ছোট ছোট চারটি অধ্যায় রয়েছে। সেখানে উল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।

পুস্তিকাটির সূচনা এভাবে হয়েছে—

'আর খোদাবন্দের বাণী ইউনাহ বিন আমতার কাছে পৌছুলো। খোদাওয়ান্দ বললেন, ওঠো আর ওই বিশাল নগরী নিনাওয়া-এ গমন করো। সেখানকার আল্লাহ-বিরোধীদের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করো। কেননা, দুষ্টতায় তারা বড় বেশি বেড়ে গেছে।'

সেই ইউনাহ পুস্তিকার সমাপ্তি হয়েছে এভাবে—

'আর খোদাওয়ান্দ ইউনাহকে বললেন, তুমি কি ওই অরণ্ডের গাছটি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এতটা ব্যথিত হয়েছো? তিনি বললেন, আমি এতটা দুঃখ পেয়েছি যে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তখন আল্লাহ বললেন, ওই অরণ্ডের গাছটির প্রতি তোমার এ পরিমাণ দয়া হলো, যার জন্য তোমাকে কোনো সম্মান ব্যয় করতে হয় নি। তুমি সেটিকে উৎপন্নও করো নি। একরাতে সে নিজ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং একরাতেই শুকিয়ে গেছে। তাহলে নিনাওয়ার মতো এত বিশাল একটি নগরী, যেখানে এক লাখ বিশ হাজারেরও অধিক মানুষ বসবাস করে, যারা নিজেদের ডান-বাম হাতের তফাত করতে জানে না, এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণ গবাদি পশু রয়েছে; তাদের ওপর দয়া করা কি আমার কর্তব্যে পড়ে না?

উল্লিখিত পুস্তিকার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনেকাংশে মিলে যায়। তবে বিবরণের যেখানে যেখানে পার্থক্য রয়েছে, সেখানে পবিত্র কুরআনের বর্ণনাই সঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনের সংবাদ ওহির মতো বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে উল্লিখিত পুস্তিকাটি একটি বিকৃত সংকলনগ্রন্থের অংশ মাত্র। এটি খোদ হযরত ইউনুস আ.-এর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয় নি, বরং এটি অন্য কারো রচনা; যেখানে হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনাবলি সংকলন করা হয়েছে।

৫। হযরত ইউনুস আ. নিনাওয়াবাসীদেরকে যে আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন, তার মেয়াদকাল নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। অর্থাৎ তিন, সাত ও চল্লিশ। ইবনে কাসির 'তিন' দিনের মেয়াদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। শাহ আবদুল কাদির চল্লিশ দিনের মেয়াদকালকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইউনাহ পুস্তিকায় চল্লিশ দিনের কথাই বলা হয়েছে।

৬। আলোচনার শুরুতেই জানিয়েছি যে, পবিত্র কুরআনের যে সূরাগুলোতে হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা এসেছে, সেগুলোর মধ্যে সূরা আম্বিয়া ও

সুরা আল-কলমে তাঁর নামের পরিবর্তে বিশেষণের মাধ্যমে তাঁর পরিচিতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুরা আম্বিয়ায় তাঁকে ذو النون [যুননুন] বলা হয়েছে। কারণ হলো, প্রাচীন আরবিতে মাছকে نون [নুন] বলা হয়। আর সুরা আল কলমের মাঝে صاحب الحوت [সাহেবুল হুত] বিশেষণে স্মরণ করা হয়েছে। حوتও মাছের-ই আরেক নাম। যেহেতু তাঁর জীবনে মাছ সংশ্লিষ্ট অনেক বড় ঘটনা ঘটেছে; এজন্য তাঁকে মাছওয়ালা বলা হয়েছে।

ইন্তিকাল

হযরত শাহ আবদুল কাদির রহ. বলেন, হযরত ইউনুস আ.-কে যে নগরীতে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। অর্থাৎ নিনাওয়া নগরীতে। সেখানে তাকে সমাহিতও করা হয়।

আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার বলেন, ফিলিস্তিনে 'খলিল' নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী রয়েছে। তার কাছাকাছি একটি জনপদ 'হুলহুল' নামে পরিচিত। সেখানকার একটি কবরকে হযরত ইউনুস আ.-এর কবর বলা হয়ে থাকে। তার কাছাকাছি আবেকটি কবর রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এটি হযরত ইউনুসের জনক মাত্তার সমাধি।

আমাদের অভিমত হলো, হযরত শাহ সাহেবের কথাই সঠিক। কারণ হলো, হযরত ইউনুস আ. সম্পর্কে আমরা যেসব ঘটনা পেয়েছি, তার সবকটি এ বিষয়ে একমত যে, হযরত ইউনুস দ্বিতীয়বার সেই নিনাওয়া নগরীতেই ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জাতির মধ্যে জীবন অতিক্রান্ত করেছিলেন। কাজেই যথাসম্ভব সত্য এটাই যে, তাঁর ইন্তিকাল নিনাওয়া নগরীতেই হয়েছিলো। তিনি সেখানেই সমাহিত হয়ে থাকবেন, যা নিনাওয়া নগরী ধ্বংস হওয়ার পর অজ্ঞাত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে হয়তো সুধারণার ভিত্তিতে হুলহুল নগরীর দুটি অজ্ঞাত সমাধিকে হযরত ইউনুস আ. ও তাঁর জনকের নামে রটিয়ে দেয়া হয়েছে। বর্তমানেও দেখা যায় যে, আল্লাহর কিছু কিছু প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের একজনেরই একাধিক কবর পাওয়া যায়। আর প্রায়শই দেখা যায় যে, নিজেদের দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল করার জন্য অপরিচিত কোনো বুযুর্গের নামে বিভিন্ন কবরের নামকরণ করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

হযরত ইউনুস আ.-এর সম্মান ও মর্যাদা

বিভিন্ন সহিহ হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা করার সময় তাঁর বিশেষ প্রশংসা ও ফযিলত প্রকাশ করেছেন। বুখারি শরিফে বর্ণিত রয়েছে—

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى.

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যেনো কখনও এ কথা না বলে যে, আমি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইউনুস বিন মাত্তা থেকে অতি উত্তম।'

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত, একবার জনৈক ইহুদি কোনো পণ্য বিক্রি করছিলো। অপর এক ব্যক্তি তার কাছ থেকে কিছু জিনিস ক্রয় করে তার যে মূল্য দিতে চাচ্ছিলো, তাতে ওই লোকটি সন্তুষ্ট হচ্ছিলো না। তখন সে বলতে লাগলো, ওই খোদার কসম যিনি মুসা আ.-কে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বানিয়েছেন আমি এ মূল্যে ওই জিনিসটি তোমার কাছে বিক্রি করবো না। জনৈক আনসারি সাহাবি তার মুখে ওই কথাটি শোনার পর ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে কষে থাপ্পড় মেরে বসলো এবং বললো, আমাদের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলার সাহস তুমি কোত্থেকে পেলে? ইহুদি লোকটি তৎক্ষণাৎ নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানালো, হে আবুল কাসেম, আমি আপনার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া একজন নাগরিক। তা সত্ত্বেও ওই আনসারি আমার মুখে কেনো চপেটাঘাত করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারি সাহাবির কাছে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন তিনি ঘটনার বিবরণ শুনালেন তখন নবীজির মুবারক চেহারা রাগে রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন, তোমরা নবীদের মধ্য হতে একজনকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দিয়ো না। কারণ হলো, প্রথমবার যখন শৃঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আকাশ ও জমিনের মধ্যকার যত প্রাণী রয়েছে, সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। তবে তারা বেহুঁশ হবে না, যাদেরকে আল্লাহ এর ব্যতিক্রম রাখবেন। এরপর দ্বিতীয় বার

শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন সর্বপ্রথম আমি-ই সংজ্ঞা ফিরে পাবো। কিন্তু আমি সংজ্ঞা ফিরে পেতেই দেখবো যে, মুসা আলাইহিস সালাম আরশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তূর পাহাড়ের সেই ঘটনার কারণে কি তাঁকে সংজ্ঞা হারানোর স্বাভাবিকতা থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে, যার কারণে তিনি এই বেহুঁশ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন, না-কি তিনি আমার আগেই সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো নবী ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম।[১]

উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহে যেভাবে বৈশিষ্ট্য সহকারে হযরত ইউনুস আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে, তার সম্পর্কে সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, এভাবে আলোচনা করার কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনাবলি অধ্যয়ন করে, তাহলে তার মনে যেনো তাঁর মহান সত্তা সম্পর্কে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশয় জন্ম না নেয়। এ কারণেই তাঁর মহান শ্রেষ্ঠত্বের ওপর আলো ফেলার মাধ্যমে যে কোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করার পথ বন্ধ করে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

নবীদের মর্যাদা ও ফযিলত

আলোচনার এ পর্যায়ে একটি বিষয়ের সমাধান পেশ করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। তা হলো, দ্বিতীয় হাদিসে হযরত মুসা আ.-এর ফযিলত সম্পর্কে নবীজি যে বিবরণ দিয়েছেন এবং لا تفضلوا بين الأنبياء বলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাঝখানে প্রাধান্য দানের ব্যাপারটিকে যেভাবে নাকচ করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে বিষয়টির সমাধান কী?

আমাদের আলোচনা এভাবেও বুঝতে পারেন যে, একদিকে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ। যেখানে মহান আল্লাহ নিজেই নবী-রাসুলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিন্যাস থাকার কথা বলেছেন। তিনি নিজেই তাদের কতককে কতকের ওপর ফযিলত দিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, انا سيِّد ولد آدم ولا فخر অর্থাৎ কোনো ধরনের গর্ব ও বড়াই

---

১. বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া

ছাড়াই বলছি, আমি সকল আদমসন্তানের সর্দার। অন্যদিকে তিনি এই হাদিসে বলেছেন, لا تفضلوا بين الأنبياء [তোমরা নবীদের মধ্যে কে উত্তম ও কার চেয়ে উত্তম সেই স্তরবিন্যাস করতে যেয়ো না]। আরো বলছেন, لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى [তোমাদের কেউ কখনও যেনো না বলে যে, আমি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইউনুস বিন মাত্তা থেকে উত্তম]। পবিত্র কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে কীভাবে সামাঞ্জস্য দেয়া হবে?

এই বিষয়ের সমাধানে মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও হাদিসের ব্যাখ্যাকারকদের থেকে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন, উভয় বিষয়বস্তুর মধ্যে এভাবে সামাঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদিসে নবীদের পরস্পরে কিংবা খোদ তাঁকে অন্যকোনো নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করেছেন, এটি তাঁর সেই সময়কার ঘোষণা যখন সুরা বাকারার উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় নি। সেসময় হয়তো তিনি সমস্ত নবীর ফযিলত, বিশেষকরে সমগ্র নবীর ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না।

এ উত্তর নিতান্তই দুর্বল। বরং প্রত্যাখ্যাত। কারণ হলো, ইহুদির সেই ঘটনা বা হযরত ইউনুস আ.-এর ফযিলত সম্পর্কিত সেই রেওয়ায়েতসমূহ মাদানী জীবনের শেষ বছরের ঘোষণা। ইতোপূর্বে নবীদের পারস্পরিক ফযিলত দানের অনেকগুলো খোদ নবীজি থেকেই বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় সমাধান হলো, যদিও উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের কয়েকটি সনদে নবীদের পারস্পরিক ফযিলত দান সম্পর্কে সাধারণ বাক্য বর্ণিত রয়েছে যে, لا تفضلوا بين الأنبياء [নবীদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না]। কিন্তু প্রকৃত বিচারে উল্লিখিত হাদিসের মূল লক্ষ্য হলো, খোদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই। যেমনটি ইহুদি লোকটির ঘটনা ও হযরত ইউনুস আ. সম্পর্কিত রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয়। কাজেই সারকথা হলো, যদিও নবীজি জানেন যে, মহান আল্লাহ তাঁকে সমস্ত আদম-সন্তানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি নিষেধ করেছেন।

এই উত্তরটিও শক্তিশালী নয়। কারণ হলো, যখন নবীজি উল্লিখিত বাক্যে বিষয়টিকে সমস্ত নবীর ক্ষেত্রে সামগ্রিক আকারে উল্লেখ করেছেন তখন সেটিকে কোনো প্রকার দলিল ছাড়া ব্যক্তি নবীর সঙ্গে বিশেষায়িত করার কোনো অর্থ হয় না।

তৃতীয় সমাধান হলো, যেসকল রেওয়ায়েতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা নাকচ করা হয়েছে সেখানে মূলত খোদ নবুওতের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্দেশ্য। নয়তো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বিচারে কারো ওপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হওয়াকে অস্বীকার করা হয় নি। যেমনটি সুরা বাকারায় বলা হয়েছে যে, মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ. [আমরা কোনো নবী-রাসুলের মধ্যে বিভেদ করি না]। আমরা এমন করি না যে, আল্লাহর সত্যবাদী নবীদের মধ্য হতে একজনকে মানি আর অন্যদের মানি না।

এই সমাধান হৃদয়গ্রাহী হতো, যদি নবীজির উল্লিখিত ইরশাদ এমন কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে হতো, যেখানে কোনো সত্য নবিকে মানা-না-মানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইহুদির সেই ঘটনাটির মাঝে খোদ নবুয়ত নিয়ে বিতর্ক ওঠে নি, বরং তাদের মাঝে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত মুসা আ.-এর মাঝে কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তর্ক হয়েছে।

কাজেই উল্লিখিত বিষয়টির সর্বোত্তম সমাধান হলো, নিঃসন্দেহে নবী-রাসুলদের মাঝে ফযিলতের স্তরগত তারতম্য রয়েছে। তাদের মাঝে একজনের অপরজন হতে এগিয়ে থাকাটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবী-রাসুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই যে রেওয়ায়েতের মাঝে নবীজি আম্বিয়ায়ে কেরামের পরস্পরে শ্রেষ্ঠত্বের ধারাক্রম টানতে নিষেধ করেছেন, তার ব্যাখ্যা হলো, কোনো নবীর ওপর অন্য নবীকে এমনভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, যার ফলে সেই অন্য নবীকে খাটো করা হয়, এটা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কোনো নবীর প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে অপরাপর আম্বিয়াদের তুলনায় তাঁর এমন প্রশংসা করা উচিত হবে না, যার পরিণতিতে অন্য নবীর উচ্চ মর্যাদাকে খাটো করা হয়ে যায়। উপরন্তু ব্যাপারটি যদি তর্ক-বিতর্কের

দিকে মোড় নেয় তাহলে এ জাতীয় স্থানে ফযিলত নিয়ে আলোচনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা, এ সময় যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বক্তা অপরাগ হয়ে অন্য নবী সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলে ফেলতে পারে, যা সেই নবীর মর্যাদায় হানিকর হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যার পরিণতিতে ঈমানের স্থলে কুফরি আবশ্যক হয়ে যাবে। যে ঘটনায় নবীজি আম্বিয়ায়ে কেরামের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে ওই জাতীয় একটি বিতর্ক ঘটেছিলো। কাজেই একথা অস্বীকার করার জো নেই যে, মহান আল্লাহ নবীগণের মাঝে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তরগত তারতম্য সৃষ্টি করেছেন। যার সম্পর্কে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ। এটি কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নয়।

উল্লিখিত বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে হাফেয ইবনে হাজার রহ. যে আলোচনা পেশ করেছেন, তা খুবই সুখপাঠ্য। তিনি লিখেছেন—

قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها كقوله تعالى { لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ } ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ }

وقال الحليمي الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الإزدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. -فتح الباري : ٦/٦

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীগণের পারস্পরিক ফযিলত দান করতে নিষেধ করেছেন। যার প্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে বলেন,

নিজস্ব অভিমত আবিষ্কার করে তার ভিত্তিতে ফযিলত প্রদান নিষিদ্ধ। এমন ফযিলত নিষিদ্ধ নয়, যা শরয়ি দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথবা এমনভাবে ফযিলত দেওয়া নিষিদ্ধ, যা ব্যক্ত করার কারণে যে নবীর ওপর ফযিলত দেয়া হচ্ছে, তার মর্যাদা খাটো করা হয়। অথবা কোনো বিতর্ক ও বিবাদ উস্কে দেয়া হয়। অথবা সেই ফযিলত নিষিদ্ধ, যার কারণে কোনো এক নবীর ক্ষেত্রে এমনভাবে সমুদয় ফযিলত একত্র করা হয়, ফলে এ কথা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, অন্য নবীর কোনো ফযিলত-ই নেই। পক্ষান্তরে এমনভাবে ফযিলত দেওয়া –যেমন কেউ বললো, মুয়ায্যিনের চেয়ে ইমাম শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা মুয়াযযিনের মর্যাদা খাটো করা হয়নি– এভাবে ফযিলত দেওয়া জায়েয। একটি দুর্বল অভিমতে পাওয়া যায় যে, উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো, খোদ নবুওতের ক্ষেত্রে একজনকে অপরের ওপর প্রাধান্য দিয়ো না। যেমনটি পবিত্র কুরআন ইরশাদ করেছে— لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ।

এর বিপরীতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোনো সম্মানিত নবীকে অন্য কারো ওপর প্রাধান্য দেওয়া নিষিদ্ধ নয়; যেমনটি নিম্নের আয়াতে মহান আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেন—تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

হালিমি বলেন, যেসব হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীগণের পারস্পরিক ফযিলত দেয়াকে নিষেধ করেছেন, তার সম্পর্ক বিশেষ ক্ষেত্রের সঙ্গে। তা হলো, যেখানে আহলে কিতাবদের সঙ্গে নবীদের ফযিলত দেয়া নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে অথবা, যেমন, মুসলমান ও খ্রিস্টান নিজের নবীকে অন্যের নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিচ্ছে। কেননা, এ জাতীয় অবস্থায় যখন দুই ধর্মের মাঝখানে বিতর্ক উঠে পড়ে তখন এমন কথার লাগাম টেনে ধরা মুশকিল হয়ে যায়, যে কথাটি অন্য ধর্মের নবীর মর্যাদায় অবমাননাকর হয়। এমনকি সেটি কুফরিকে পর্যন্ত আবশ্যক করে তোলে। [কারণ, সব ধর্মের সকল সত্য নবীকে নিজের নবী মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয]। এর বিপরীতে যদি এটাই উদ্দেশ্য হয় যে, নবীগণের পারস্পরিক ফযিলত আলোচনা করার কারণে একজনের ওপর অন্যজনের প্রকৃত প্রাধান্য প্রমাণিত করা হবে, তাহলে এটি নিষিদ্ধ নয়।[১]

---

১. ফাতহুল বারি ৬/৬

শিক্ষা ও উপদেশ

যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে হযরত ইউনুস আ.-এর জীবনী অধ্যয়ন করা হলে নিম্নের বাস্তবতাগুলো দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠবে—

১। মানবসম্প্রদায়ের হেদায়েতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর 'চিরন্তন নীতি' হলো, যখন কোনো জাতি তাদের নবীর দাওয়াত থেকে অব্যাহতভাবে মুখ ফিরিয়ে রাখে; অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারকে নিজেদের প্রতীক বানিয়ে ফেলে আর আল্লাহর নবী তাদের ওপর আযাব নেমে আসার সংবাদ প্রদান করেন, তখন সেই জাতির সামনে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে। হয়তো তারা আযাব আসার পূর্বেই ঈমান নিয়ে আসে, ফলে আযাব থেকে বেঁচে যায়, আর না হয় ঈমান না আনার কারণে আযাবে নিপতিত হয়। যদি নবীর আযাবের সংবাদ দেয়ার পর আযাব নেমে আসার পূর্বে তারা ঈমান না আনে, তাহলে সেই আযাব থেকে তাদের রক্ষা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হয় না। হযরত নুহ, সালেহ, লুত আলাইহিমুস সালামের জাতিসহ আদ, সামুদ প্রভৃতি পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর বিশাল সভ্যতা, অতি উন্নত কৃষ্টি, অত্যাচারী শক্তি ও প্রতাপের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার আযাবে মুহূর্তেই পৃথিবীর বুক থেকে তাদের ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস এই সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২। বিগত দিনে যত উম্মত অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে হযরত ইউনুস আ.-এর জাতি ভিন্ন একটি উদাহরণ দাঁড় করিয়েছে। তারা আযাব নেমে আসার পূর্বেই ঈমান এনেছে এবং তারা আল্লাহর সত্য অনুসারী ও অনুগত হওয়ার মাধ্যমে আযাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। কতই না ভালো হতো, যদি তাদের পরবর্তীকালে আগমনকারী বিভিন্ন জাতি ও প্রজন্ম হযরত ইউনুসের জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এভাবে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হতো। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তেমনটি ঘটে নি।

৩। পৃথিবীর অন্য সকল বিশেষ মানুষসহ সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মহান আল্লাহ যে আচরণ করে থাকেন, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সঙ্গে তাঁর

আচরণ হয় এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং সেটাই হওয়া উচিত। কারণ হলো, তারা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা ও কথা শোনার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই আল্লাহর বিধান পালন করার যে দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে তা অন্য কারো ওপর ন্যস্ত নয়। যার কারণে তাঁদের কর্তব্য হলো, তাঁরা যে কাজ-ই করবেন তা অবশ্যই আল্লাহর ওহির আলোকে হতে হবে। বিশেষ করে, দীনের প্রচার ও হকের পয়গাম সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে আসমানি ওহির ইলমে ইয়াকিনের সঙ্গেই তাঁদের বন্ধন থাকতে হবে। যার কারণে যখন তারা কোনো কাজে দ্রুততার আশ্রয় নিয়ে ফেলেন অথবা ওহির অপেক্ষা না করে কোনো কথা বা কাজের পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন, তখন –বিষয়টি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেনো– তাঁদেরকে মহান আল্লাহ কঠিনভাবে পাকড়াও করে থাকেন। এসময় অবস্থাচিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য আল্লাহ তাআলা এমন অভিব্যক্তি ব্যবহার করেন যে, শ্রবণকারী মনে করবে, বাস্তবেই তারা বুঝি বিশাল কোনো অন্যায় করে ফেলেছেন। তবে যাই ঘটুক, সবসময়ের মতো এমন নিদারুণ মুহূর্তেও মহান আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত থাকে। আর তারাও তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে নিজের অনুতাপ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দু-হাত তুলে ধরেন। তওবা ও ইসতিগফারের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করেন। ফলে অতি দ্রুত তারা মহান আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে যান। যা তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাকে পূর্বাপেক্ষা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

পবিত্র কুরআনের বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনাশৈলীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত মৌলিক তথ্যটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া যাবে না। যদি কেউ উল্লিখিত বিষয়টি না জানে তাহলে সে এ জাতীয় স্থানে মারাত্মক সংশয়ে পড়ে যাবে। সে দেখবে, একদিকে মহান আল্লাহ একজনকে নবী ও রাসুল বলে প্রশংসার অঞ্জলি ঢেলে দিচ্ছেন আর অন্যদিকে কথাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি বুঝি চরম কোনো অন্যায় করে ফেলেছেন। যার কারণে প্রথমে সে অবশ্যই হয়রান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। এরপর হয়তো সে বক্রপথে নেমে পড়বে অথবা ওয়াসওয়াসার অন্ধকার প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। কাজেই আবশ্যক হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কিত ঘটনাবলি ও সংবাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মৌলিক তথ্যটি সবসময় দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে, যেনো সিরাতুল মুসতাকিম থেকে পা ফসকে না যায়।

৪. ইসলামের শিক্ষা হলো, আল্লাহর সকল সত্য নবী –তিনি যে ধর্মের-ই হোন না কেনো– তার ওপর তেমনই ঈমান রাখতে হবে, যেভাবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ঈমান রাখতে হয়। আমাদের নবী সকল নবী-রাসূলের সর্দার এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, এই বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও তাঁর এমনভাবে প্রশংসা করা যাবে না যার দ্বারা অন্য নবীকে হেয় ও নীচ করতে হয়। এটা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

ষষ্টখণ্ড সমাপ্ত